শুকতারা
অষ্টাত্রিংশৎ বর্ষ
নবম সংখ্যা
কার্তিক • ১৩৯২

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অবস্থা সামাল দেবার জন্য ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো পামেলা – কিন্তু...

তুমি এটা নিয়ে যেতে পারবে না! আমি তাহলে– উঃ!

চুপ, নাহলে তোমার চোয়াল আমি ভেঙে দেবো!

কৌশিক এগিয়ে এলো – কিন্তু একটা রিভলভারের নল তার দিকে ঝিকিয়ে উঠলো...

তুমি... তোমাকে আমি দুটুকরো করে ফেলবো!

অতো কষ্টের দরকার নেই চলুন বস আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন...

চিনি শোধনাগারের কাছে ওরা ডালমিকোকে দেখতে পেলো... তার মুখের হাসি প্রশ্নেলিকাময়!

সেনর, আপনি বোধহয় এই আচরণের ব্যাখ্যা করবেন?

সেনোরিটা তুমি একজন অবাঞ্ছিতের সঙ্গে মেলামেশা করেছো! এটা দুঃখের। কিন্তু আপনার কৌতূহল এখনো মেটেনি সেনর?

সেই দুর্বোধ্য হাসি মুখে নিয়ে সে ওদের একটা বিরাট গুদামঘরের মধ্যে নিয়ে গেলো...

সেনর বোধহয় এই যন্ত্রপাতি ঠিক মতো চিনতে পারেন নি! না নিশ্চয় নয়... মনে হয় আরো আলো সাহায্য করবে...

আলো ঝলকানি দিয়ে উঠলো – আর একটা বিরাট উজ্জ্বল ধাতুর কাঠামোর দিকে ওরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মোটা ছাদ দিয়ে ওড়ার অপেক্ষায়...

আন্তঃ-মহাদেশীয় ক্ষেপনাস্ত্র! আমাদের অতি নিজস্ব! এবছরের এটাই আমাদের ফসল!

মানচিত্রে ইতিহাস

বাংলা ভাষাতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত ছবি ও মানচিত্রের সাহায্যে ইতিহাস শিক্ষার অপূর্ব বই।

আদিম যুগের ভারতের মানচিত্র তারপর তার পরিবর্তন, আর্য যুগ, মহাভারত, অশোক থেকে বর্তমান পর্যন্ত ছবির সাহায্যে দেখান আছে।

এতে আছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্তম্ভ মন্দির ও পুরাকীর্তির সব প্রামাণ্য ছবি।

চার রঙের অফসেটে ছাপা ৯৪ পৃষ্ঠার বিরাট এই অসাধারণ বই

ষোল টাকা পাঠালে রেজিষ্টারী করে বই পাঠান হবে।

দেব সাহিত্য কুটীর

২১নং ঝামাপুকুর লেন· কলিকাতা- ৯

বাঁটুল দি গ্রেট

একটু আগে এক ডাকাত দুই চেলা নিয়ে আমার ব্যাঙ্ক লুঠ করে ঐ দিকে পালিয়ে গেলো, বাঁটুল।
দি গ্রেট ব্যাঙ্ক
বস্, তোমার দেখেছি দারুণ হাতযশ! তোমার দৌলতে কেমন ফস করে ব্যাঙ্কের টাকা আমাদের হাতে এসে গেলো!
এবার চটপট আমার লুকোবার আড্ডায় চল।
পায়ের দাগ তাক করে যেতে হবে।
মরেচে! পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে! বাঁটুলদা এলেই সর্বনাশ!
কে বাঁটুলদা? এলে গুলি মেরে চালুনি বানিয়ে ছেড়ে দেবো। আমার নাম ন্যাদা মস্তান।
খস খস! খস খস!
গুহাটা থেকে শব্দ আসছে। নির্ঘাত ওখানেই লুকিয়ে আছে!
খচমচ! খচমচ!
টের পাবার আগেই ঝট করে পাকড়াতে হবে।
ধুপ ধাপ! দমাস ধাঁই! ধপাস!
আদতে ডাকাতই নয় এটা একটা ভালুক।

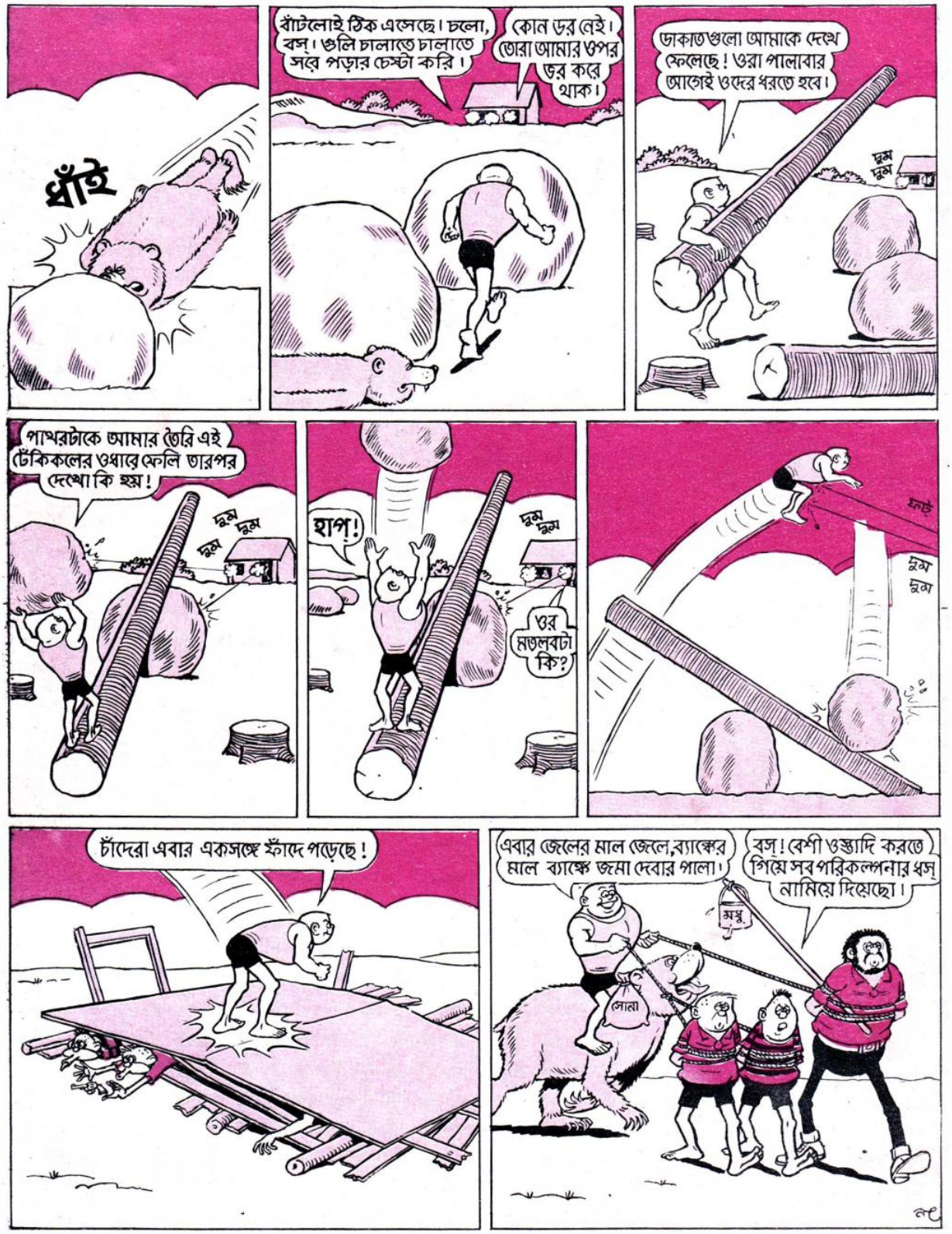

ধাঁই
বাঁটলোই ঠিক এসেছে। চলো, বস্। গুলি চালাতে চালাতে সরে পড়ার চেস্টা করি।
কোন ডর নেই। তোরা আমার ওপর ভর করে থাক।
ডাকাতগুলো আমাকে দেখে ফেলেছে! ওরা পালাবার আগেই ওদের ধরতে হবে।
দুম দুম
পাথরটাকে আমার তৈরি এই ঢেঁকিকলের ওধারে ফেলি তারপর দেখো কি হয়!
দুম দুম দুম
হাপ্!
দুম দুম
ওর মতলবটা কি?
ফট
দুম দুম
চাঁদেরা এবার একসঙ্গে ফাঁদে পড়েছে!
এবার জেলের মাল জেলে, ব্যাঙ্কের মাল ব্যাঙ্কে জমা দেবার পালা।
বস্! বেশী ওস্তাদি করতে গিয়ে সব পরিকল্পনার ধস্ নামিয়ে দিয়েছো।
মধু
সোনা

শুকতারা

কার্ত্তিক, ১৩৯২

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 439/1 (2) T. B. C. (Dated 25th January 1982. 2a-2t/81)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক/লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	অজানা দ্বীপের বিভীষিকা (ছবিতে গল্প)–নারায়ণ দেবনাথ	প্রচ্ছদ
২।	বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন ছবিতে গল্প)–নারায়ণ দেবনাথ	১
৩।	এটিকেট জানো না (কবিতা)–অরুণ চট্টোপাধ্যায়	৫
৪।	রামধনুর সন্ধানে (রঙিন ছবিতে গল্প)–ময়ূখ চৌধুরী	৬
৫।	মামাবাড়ি গেল রামসুখ রাম (অগ্নিযুগের সৈনিক)–সুধীন্দ্রনাথ রাহা	৮
৬।	দুখীরাম শান্তিরাম (ভূতের গল্প)–মণিলাল মুখোপাধ্যায়	১২
৭।	টুকটুক (রূপকথার গল্প)–প্রিয়রঞ্জন মৈত্র	১৫
৮।	গুপ্তধনের সন্ধানে (ছবিতে গল্প)–হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৮
৯।	পাথরের চোখ (গল্প)–শিশির বিশ্বাস	২০
১০।	নীল দরিয়ার দশভুজ (জীব বিজ্ঞানের গল্প)–হরিপদ ঘোষ	২৬
১১।	যাদুর দেশে টারজান (অ্যাডভেঞ্চার)–সব্যসাচী	২৯
১২।	খেলাধূলা–শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫
১৩।	স্টার ট্রেক (ছবিতে কল্প বিজ্ঞানের গল্প)– রণ হ্যারিস ও শ্যারমান ডিভোনো	৪৬
১৪।	অলৌকিক (সত্যঘটনা)–নন্দলাল ভট্টাচার্য	৪৮
১৫।	পিকু আর ভিকু (গল্প)–সর্বাণী সাধুখাঁ	৫০
১৬।	আবিষ্কারের গল্প (ফিচার)–গণেশ ঘোষ ও মদন মুখোপাধ্যায়	৫৩
১৭।	হাতের কাজ হাতে নাতে (হাসির গল্প)–চন্ডী লাহিড়ী	৫৮
১৮।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)–	৬০
১৯।	মণি-মুক্তো (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)–সলিলকুমার বসু	৬৩
২০।	ভ্রাতৃস্নেহ (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)–দিলীপ ঘোষ	৬৪
২১।	গিরিবালা ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা (ঘোষণা)	৬৫
২২।	লটারির টিকিট (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)–রত্না রায়	৬৬
২৩।	শপথ (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)–সুব্রত পন্ডিত	৬৭
২৪।	হাঁদা-ভোঁদা (ছবিতে মজার গল্প)–নারায়ণ দেবনাথ	৬৮
২৫।	দাদুমণির চিঠি–	৭০
২৬।	তোমাদের পাতা–	৭১
২৭।	ঘুরে এলাম মানস-কৈলাস (ভ্রমণ কাহিনী)– শুভাশীষ বিশ্বাস	৭৩
২৮।	সাহেব বাংলোর ভূত (ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস)– স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৬

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১ নং বামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

চাঁদা–বার্ষিক–সডাক ৪২ টাকা, ষান্মাসিক–২১ টাকা। মূল্য—টাঃ ৩·৫০

ছবি দেখতে ছোটরা ভালোবাসে। রংচংয়ে ছবি হলে তো কথাই নেই। সেই দিকে নজর রেখে

দেব সাহিত্য কুটীর

একের পর এক বের করে চলেছেন অফসেটে ছাপা রংবেরংয়ের ছবিতে ভরা সব বই। ছবি দেখতে দেখতেই ছোটরা শিখে যাবে অ, আ, ক, খ, এ, বি, সি, ডি, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ আরও অনেক কিছু।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

বর্ণপরিচয়

(প্রথম ভাগ)

দাম : ৫.৫০ পয়সা মাত্র

অফসেটে ছাপা বড় আকারের নতুন বই। আগাগোড়া চার রংয়ে ছাপা অজস্র ছবিতে ভরা বর্ণপরিচয়ের নবতম সংস্করণ।

খুশির পড়া

দাম : ৬.০০ মাত্র

খুশি হয়ে পড়ার মতো বই-ই বটে। পাতায় পাতায় রংয়ের বাহার, ঝকঝকে সব ছবি ছোটদের তাক লাগিয়ে দেবে।

গুণতে মজা

দাম : ২.৫০ মাত্র

ছবি আর ছড়া দিয়ে ছোটদের যেমন গুণতে শেখানো হয়েছে তেমনি শেখানো হয়েছে যোগ, বিয়োগ করতেও। ছবি দেখে ছড়া পড়তে পড়তেই ছোটরা শিখে যাবে অংকের প্রথম পাঠ

খোকাখুকুর ABC

দাম : ২.৫০ মাত্র

বাংলার সাহায্যে ইংরাজি শেখানোর বই আর বোধহয় নেই। রংচংয়ে ছবি দেখতে দেখতেই ছোটরা শিখে যাবে ইংরাজি অক্ষরমালা।

আদর্শ লিপি ও সহজ বর্ণপরিচয়

দাম : ৬.০০ মাত্র

ছোটদের বর্ণপরিচয়ের এক মজাদার বই। একটি বইয়েই বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি আর উর্দু বর্ণমালা শেখার সুযোগ রয়েছে।

ছবিতে ভারতের ইতিহাস

দাম : ২.৫০ পয়সা মাত্র

দেশের কথা জেনে ছোটরা যাতে বড় হতে পারে সেইজন্যেই চার রংয়ে ছেপে নাম মাত্র দামে বার করা হয়েছে এই বইটি।

ছোটদের চিড়িয়াখানা	আগড়ুম বাগড়ুম	ইকড়ি মিকড়ি
দাম : ২.৫০ পয়সা মাত্র	দাম : ২.৫০ মাত্র	দাম : ২.৫০ মাত্র

ছবিতে ভরা ছোটদের ভালো লাগার মতো দারুণ তিনটি ছড়ার বই। হাতে পেলে ছোটরা এর একটিও ছাড়তে চাইবে না।

দেব সাহিত্য কুটীর ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা–৯

শুকতারা

৩৮শ বর্ষ ● ৯ম সংখ্যা ● কার্ত্তিক, ১৩৯২/অক্টোবর, ১৯৮৫

এটিকেট জানো না ?

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

আরে এসো এসো, খেয়ে যাও–
আমার এই হোটেলে
কাটলেট চপ ফ্রাই করে দেখো ভাই ট্রাই
উ হু বাপস্ বলে কেন চেঁচালে ?
আরে ! বাসি নয়, বাসি নয়, টাটকা যে মাংস,
রবার তো ওটা নয় খাস রাজহংস,
মটনটা সেরা পাবে শোন শোন কংস
চিংড়িটা একদম গলদার বংশ।
রাঁধুনীযে সেরা মোর সারা কোলকাত্তায়
চুলগুলো খাড়া কেন শরীরটা ভাল নয় ?
ডুবো না কো একদম আজে বাজে চিন্তায়,
গপাগপ গিলে ফেলো ভাল নয় অপচয়।
চারিদিকে লোকগুলো বাজে কথা বলেছে
সব ব্যাটা বুজরুক খাবার কি চিনেছে ?
প্যান্টুল ধরে যারা চম্পট মেরেছে
ওরা সব ধামাধরা পেছনেতে লেগেছে।
ওকি ! ওকি ! ওঠো কেন ? সেরা চীজ চেনো না ?
কান লাল চোখ লাল নিয়ম কি মানো না ?
খাবার এই দুর্দিনে ফেলে দেওয়া ভাল না
আচ্ছা তো বোকা তুমি, এটিকেট জানো না ?

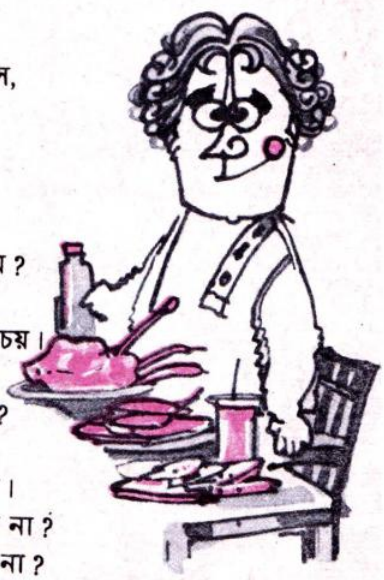

ছবিঃ সুশান্ত বিশ্বাস

আমি তোকে হত্যা করব। কিন্নররাজ শলভের সন্ধান তুই পাবি না।
এবার তোর নিস্তার নেই— হালুম!
কৃষ্ণ ব্যাঘ্রের নিক্ষিপ্ত প্রস্তর এড়িয়ে গেল অশনি – কিন্তু ব্যাঘ্রের ভীষণ গর্জনে বাতাসে জাগল প্রচণ্ড আলোড়ন এবং ভেঙ্গে পড়তে লাগল পাথরের স্তম্ভগুলি!...
মনে হচ্ছে যেন ভূমিকম্প হয়ে গেছে। কৃষ্ণ ব্যাঘ্রকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সামনে একটা সুরঙ্গ দেখছি— ঐ পথেই যাব...
কিছুদূর যেতেই মানুষের সাক্ষাৎ পেল অশনি...
দেখ! আমাদের ত্রাতা এসেছে!
এইবার আমরা বিপদ থেকে মুক্ত হব।
বিপদ!... কী বিপদ?
এই সুরঙ্গপথে কখনও পার্থিব মানুষ প্রবেশ করে নি। তুমি নিশ্চয়ই দেবপ্রেরিত। এস, আমাদের নেতার কাছে...
কিন্নররা সুযোগ পেলেই আমাদের আক্রমণ করে। আমাদের নেতা কিন্নরের আক্রমণে আহত। তুমি সাহায্য করো।
কিন্নর!
আমি দেবপ্রেরিত নই। কিন্তু কিন্নরদের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। সম্ভব হ'লে আমি তোমাদের সাহায্য করব।
আহত নেতা উঠে দাঁড়িয়ে একটি অসি গ্রহণ করল..
এই অসি গ্রহণ করো। তুমি সুরঙ্গপথ ধরে অগ্রসর হ'লে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর উপস্থিত হ'বে। সেইখানেই তুমি অশ্বমানব কিন্নরদের সাক্ষাৎ পাবে।
কলভ! আজ তোমার শেষ দিন!
নির্বোধ! এখনই তোকে প্রাণভিক্ষা করতে হবে।
প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে এক আশ্চর্য দ্বন্দ্বযুদ্ধের দৃশ্য দেখল অশনি...

কিন্নরজাতি দেখছি মানুষের মতোই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে!... এই তাহলে শলভ,— যার কাছে আমি এসেছি।

শলভ! আমায় হত্যা কোরো না। ক্ষমা করো।

পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করাই বীরের ধর্ম।

আঃ হা! কিন্নররাজ্যে একটা মানুষ এসেছে! ওকেই আগে হত্যা করব।

আমাকে হত্যা করা সহজে নয়, শলভ! কিন্তু আমি যুদ্ধ করতে আসি নি, এসেছি একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে।

ওহে মনুষ্যশাবক! তুমি যদি এক ক্রোশ পথ আমার পিঠে চড়ে যেতে পারো, তাহলে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব।

বাঃ! তুমি দেখছি দক্ষ অশ্বারোহী!

শলভ তীরবেগে ছুটল...

সামনে গভীর খাদ, তলায় খরস্রোতা নদী – আমি এবার লাফ দেব। প্রাণের মায়া যদি থাকে, তাহলে আমার পিঠ থেকে নেমে যাও।

এক ক্রোশ পথ পার হওয়ার আগে আমি তোমার পিঠ থেকে নামব না।

তবে মরো!

পতনের বেগে গভীর জলে ডুবে গেল তারা, — শুধু শলভের পিঠে অনড় হয়ে বসে রইল অশনি...

আবার তারা ভেসে উঠল... তীব্র জলস্রোত তাদের নিয়ে ছুটতে লাগল... তখনও শলভের পিঠের উপর অনড় হয়ে বসে আছে অশনি..

এক ক্রোশ পথ পার হয়ে এসেছি – এবার বলো, কোথায় আছে রামধনু?

মাথার উপর আকাশকে ধারণ করেছে ময়দানব – সে জানে রামধনুর সন্ধান।

আচম্বিতে চারদিক কাঁপিয়ে ভেসে এল বজ্রপাতের মতো ভয়ংকর শব্দ!...

কিন্তু ময়দানবের সাক্ষাৎ তুমি পাবে না – সামনে কী দেখছ?

সর্বনাশ!

16

[চলবে]

মামাবাড়ী গেল রামসুখ রাম

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

পশ্চিম-আকাশের কোলে কোলে মেঘের জটলা। তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে ফালি ফালি লালচে রোদ্দুর অস্তসূর্যের। নদীর ধারে ধওলা গাঁওয়ের হাটে জোর কেনাবেচা চলছে তখনো।

হাট জমতে শুরু করে দুপুরের পরেই। সকালে ? না, মাঠের কাজ বন্ধ করে দেহাতি মানুষ সকালে হাটে আসতে পারে না। তবে হ্যাঁ, মংগল আর শনিবারগুলোতে ওরা কাজটা একটু সংক্ষেপ করার চেষ্টা করে ক্ষেতে ক্ষেতে। অন্যদিন যেখানে বাড়ি ফেরার কথা মনেও হয় না বেলা গড়িয়ে না গেলে, ঐ দুটো দিন সেখানে, হ্যাঁ, সূয্যি পশ্চিমে ঢলবার আগেই বলদের কাঁধ থেকে জোয়াল নামিয়ে ফেলে চাষীরা।

আজ মংগলবার, তাই সদাসুখ রাম বাড়ি ফিরেছিল দুপুরের আগেই। বলদ জোড়াকে জল খাইয়ে এনে বেঁধে দিয়েছিল বাড়িরই সামনে মেটে পথের ধারে। সন্ধ্যে পর্যন্ত যা পারে ওরা, ঐ খুঁটে খুঁটে খাক ঘাস-পাতা। তারপর বউ ওদের গোয়ালে তুলবে, বিচালি কেটে জলে ভিজিয়ে ডাব্বা ভরে খেতে দেবে যত্ন করে। বাপ্! ওদের যত্ন না করলে চলে ? বলতে গেলে, ওদেরই মেহনতে তো করে খাওয়া! আঙিনায় ঢুকেই সদাসুখ চ্যাঁচাতে শুরু করে দিয়েছিল–"হ্যাঁরে ও রামসুখোয়া, তোর খাওয়া দাওয়া মিটেছে তো ? তুই আমার সংগে আজ হাটে যাবি কথা আছে না ?"

"কথা তো আছে। যাবও বটে, কিন্তু কাল পান্‌শাই (পন্ডিত মশাই)আমার পিঠের ছাল তুলে নেবে আঁক না কষে নিয়ে গেলে। তুমি নেয়ে খেয়ে নাও, তৎক্ষণ আমি দেখি যদি দু'টো আঁকও বাগাতে পারি।"

সদাসুখ নিজে অক্ষরজ্ঞানবর্জিত মানুষ, লেখাপড়া শেখার কোনো সার্থকতা আছে পৃথিবীর কোনো জীবের পক্ষে, তা সে স্বীকার করে না। "আমার বলদ লেখাপড়া শেখেনি, তবু তারা খেতে পাচ্ছে। আমার বৌ লেখাপড়া শেখেনি, সেও খেতে পাচ্ছে। আমি নিজে লেখাপড়া শিখিনি, তবু নিজে তো পাচ্ছিই খেতে, ফাউ হিসেবে, একটা বউ, তিনটে ছেলে মেয়ে, দু'টো বলদ, একটা গাই, একটা কুত্তা, খেতে দিচ্ছি এদের সবাইকেই, তুই বাবুর ব্যাটা বাবু রামসুখোয়া রাম, তোকে এ বদ বুদ্ধি কে দিলে বাপু ? না খেয়ে মরে যাবি, বলে দিচ্ছি। এক্ষুণি ছাড় ও বদ নেশা।"

মুখে তড়পায়, কিন্তু কার্যত এমন কিছু করে না সদাসুখ, যাতে রামসুখোয়ার পড়াশুনা সত্যিই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেটা সম্ভবতঃ তার বৌ জগ্‌ধাতারির (জগদ্ধাত্রীর) পরোক্ষ প্রভাববশতঃ। জগদ্ধাত্রীর এক ভাই কাশী বিদ্যাপীঠে বেয়ারার কাজ করে, চাকরি পাওয়ার পরে সেখানেই সে নাম সই করতে শিখেছে। তারই গৌরবে জগদ্ধাত্রী নিজেকে গার্গী লীলাবতীর সগোত্র বলে মনে করে। এবং, যেহেতু চল্লিশোর্ধ্ব স্বামীকে আর এখন পাঠশালে পাঠানো সম্ভব হয় না, তাই আপোস-রফা হিসাবে তার কাছ থেকে সম্মতি

আদায় করেছে, রামসুখোয়া অন্তত যাক পান্‌শাইয়ের কাছে। নরাণাং মাতুলক্রমঃ, একটা কথাই তো আছে এদেশে। রামসুখোয়ার মাতুল যখন বিদ্যাপীঠের বেয়ারা, নিজে রামসুখোয়া অবশ্যই সেই বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক-পদে বসবার আশা করতে পারে একদিন।

সচরাচর সদাসুখ একাই যায় ধওলা গাঁওয়ের হাটে। তিন ক্রোশ তিন ক্রোশ ছয় ক্রোশ রাস্তা তো? ওর পক্ষে কিছুই নয় তা। প্রথম এক ক্রোশ ঢিমিয়ে হাঁটে, তারপরের ক্রোশটা খতম করে দেয় একটি মাত্র দৌড়ে, আবার শেষ ক্রোশের বেলায় হাঁটা শুরু করে সেই ঢিমে তেতালাতেই মোটের মাথায় ঘণ্টা দেড়েকের বেশি সে কোনমতেই লাগতে দেয় না এইটুকু রাস্তা পেরুতে। তা, তার মাথায় ড়াহিড়ির বোঝা যত ভারীই হোক। ড়াহিড়ি! অড়হর। ঐটি বেচতেই ওর যাওয়া হাটে। আর অবশ্য জগ্‌ধাতারির এটা-ওটা-সেটা ফাই-ফর্মাইস থাকেই। তা সে আর কতটুকু বোঝা! ফেরার সময় ড়াহিড়ি আর থাকে না কাঁধে, সওদাগুলো একটা থলেতে পুরে, থলেটা লাঠিতে ঝুলিয়ে সে দিব্যি আরামে পিঠের দিকে নামিয়ে দেয়, আর গাঁয়ের অন্য হাটুরেদের সংগে গালগল্প করতে করতে বাড়ি ফেরে রাত এক পহর হওয়ার ঢের আগেই।

আজ কিন্তু একা আসেনি সদাসুখ। ছেলেটাকে এনেছে সংগে। কারণ হাটের পরে সে বাড়ি ফিরবে না আজ রাতে। হাট থেকেই চলে যাবে বোনের বাড়ি, ধওলা গাঁও থেকে উত্তরে তিন ক্রোশ। বোনটার নাকি অসুখ চলছে খুব। একবার দেখতে না গেলে নয়। তাই ছেলেকে সংগে নেওয়া। ড়াহিড়ি অবশ্য বিক্রি হয়ে যাবেই। কিন্তু বস্তাটা থাকবে, আর জগ্‌ধাতারির ফর্মাইসি সওদাও কিছু। সেগুলো ফিরিয়ে আনার জন্যই রামসুখোয়াকে খাটানো। তা, অসুবিধে কী? গাঁয়ের অন্য লোকও তো ফিরবে? বারো বছরের ছেলে, শহুরে বাবুদের লেড়কা নয়। দেহাতের রোদে পোড়া জলে ভেজা তাগড়া ছেলে, সে সন্ধ্যে রাতে বাড়ি ফিরতে পারবে না, এও কি একটা কথা নাকি?

সব ড়াহিড়ি যখন বিক্রি হয়ে গেল, পশ্চিম-আকাশের কোলে কোলে মেঘেরা শুরু করেছে জটলা, আর তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে লালচে রোদ্দুরের চোখা চোখা ফালি এসে পড়েছে কাঞ্জি নদীর কাকচক্ষু জলে। সন্ধ্যে হতে দেরি আছে তখনো।

সদাসুখ ড়াহিড়ির খালি বস্তা, আর জগ্‌ধাতারির ফর্মাইসি মাল কয়টা ছেলের জিম্মা করে দিয়ে বলল–"তুই একটু দেরি কর হাটে। তোর বন্‌শী দাদো আর তেরপুনিয়া নানী যখন রওনা দেবে বাড়ি বলে, তুই সংগে যাবি তাদের। আমি এগিয়ে পড়ি ততক্ষণ। ভিন্‌গাঁয়ে যাওয়া। দিনের আলো থাকতে থাকতে যতটা পথ মেরে দেওয়া যায় ততই ভাল! হাটুরে ওদিকেও ঢের ফিরছে বটে, কিন্তু চিনি নে তো তাদের কাউকে।"

"তুমি এগিয়ে পড়। কাল সকালেই ফিরছ তো?"

"জরুর। তবে ফিরতে বেলা এক পহর হয়ে যাবে। লাংগলটা বিকেলেই নামাব, কী আর করা যায়!"

বাপ-বেটা বিদায় নিল পরস্পরের কাছে। তারা কি জানে যে সেই বিদায়ই চিরবিদায়?

উত্তর দিকে চওড়া সড়ক বেরিয়ে গিয়েছে মাখমপুরার উদ্দেশে। সেই পথের লাল ধুলোর মাঝে সদাসুখের দীর্ঘ মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গেল যখন, রামসুখ তাকিয়ে দেখল আকাশের দিকে। সূর্য মেঘে ঢাকা পড়েছে বটে। কিন্তু বেলা যে এখনো বেশ খানিকটা আছে, তা বেশ বোঝা যায়। এক্ষুণি যদি উড়ে যায় মেঘটা, ঝকমকিয়ে উঠবে চারিধার। না-ও যদি ওঠে, যেটুকু আলো আছে আকাশে, তাই থাকতে থাকতেই রামসুখোয়া অর্ধেকের বেশি পথ মেরে দেবে অনায়াসে। তার বাবা দৌড়োয় এক ক্রোশ রামসুখ নিজে দৌড়োবে গোটা তিনক্রোশ রাস্তাই। নাঃ, বন্‌শী দাদো আর তেরপুনিয়া নানীর জন্যে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকবে, এমন পাত্র রামসুখ রাম নয়।

খাটো ধুতিখানা আঁটো করে পরে বস্তাটা সে পিঠে ঝুলিয়ে নিল লাঠিতে করে। আর দক্ষিণ দিকের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে শুরু করল ধীর কদমের দৌড়। বেরুবার সময় তেরপুনিয়া নানীকে ডেকে বলে গেল–"আমি এগিয়ে যাচ্ছি নানী।" নানী তখন কাঁকুড় বিক্রির ধাঁধায় এত ব্যস্ত যে রামসুখোয়ার সেকথা কানেই গেল না তার। রামসুখ চোখের পলকে বেরিয়ে পড়ল হাট থেকে।

ধীর কদমে দৌড়োচ্ছে সে। দীর্ঘ পথ দৌড়তে হলে রুদ্ধশ্বাস দৌড় বিশেষ কাজ দেয় না। ওতে অল্পেতেই হাঁপিয়ে পড়তে হয়। দৌড়োবার কথা দূরে থাকুক, হাঁটবার শক্তিই লোপ পায় খানিকক্ষণ পরে। ধীর কদমেই রামসুখ দৌড়োচ্ছে। চোখের সমুখ থেকে দিনের আলো নিবে আসছে ক্রমেই। সন্ধ্যাই ঘনিয়ে এল? না, মেঘগুলো নিবিড় হয়ে এল? আকাশের দিকে দুই একবার দু'চোখ তুলে দেখল রামসুখ, আলোর সেই লাল ফালিগুলো আর চোখে পড়ল না।

তা সে যা খুসী তাই হোক, সন্ধ্যাই হোক, আর ঝড়বৃষ্টিই শুরু হোক, বেরিয়ে যখন পড়েছে রামসুখ, এতদূর যখন পেরিয়েই এসেছে, হাটের দিকে ফিরে

গুড়ুম গুম পিস্তল চলতে লাগল এলোপাথাড়ি।

যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না আর! সেখানে অবশ্য টিনের চালা আছে বড় বড়, দুর্যোগের সময় দাঁড়ানো যায় সেখানে। আর এখানে? তেপান্তর মাঠ, যেদিকে তাকাও। মাঠের মধ্যে ধুলো ওড়া রাস্তা একটা, হাটুরে লোক সব হাটেই আছে এখনো। পথের মাঝে একমাত্র পথিক এখন ঐ রামসুখোয়া, তাগড়া ছেলে বারো বছরের।

হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে বিদ্যুৎ চমকালো একবার, আর তারপরই আকাশ ভেংগে গেল চৌচির হয়ে, বাজ পড়ল অদূরে কোথায়, কড়কড় কড়াং আওয়াজে।

চোখ দুটো সত্যিই ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। দু মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকতে হলো রামসুখকে। যখন দৃষ্টি ফিরে এল চোখে, তখন দেখে, অনেকটা দূরে হলেও, ঠিক সমুখে রাস্তার ধারে তালগাছটা জ্বলে উঠেছে আগাপাস্তলা। দেখা-মাত্র দারুণ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে এল রামসুখ। হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে সে বাঁয়ের দিক দিয়ে নেমে পড়ল মাঠের ভিতর। এদিকে একটা বাগান আছে, জানা আছে তার। আর সেই বাগানে একটা ভাংগা মন্দির। পূজা-টুজা সেখানে নাকি হয় মাঝে মাঝে। তাও হয় দিনের বেলাতেই। রাত্রে নিশ্চয় লোক নেই সেখানে। তা, লোক ওর দরকার নেই, যা একান্ত দরকার, তা হল একটু মাথা বাঁচাবার আশ্রয়।

বৃষ্টি তখন নেমে পড়েছে মুষলধারায়। ভিজতে ভিজতে সে একবার ভাবল, বস্তাটা ঝুলছে পিঠের দিকে, সেটাকে মাথায় চাপা দিলে হয়। কিন্তু হাত বাড়িয়ে দিতেই তার ঠাহর হল, লাঠির ডগায় বস্তা নেই। পড়ে গিয়েছে কখন। কোথায় যাবে সে এখন বস্তা খুঁজতে?

ছুটে গিয়ে বাগানের ভিতর ভাংগা মন্দিরে উঠল সে। দরোজা জানালা নেই। হু-হু হাওয়া ঢুকছে মন্দিরের ভিতরেও। বৃষ্টির ছাঁটও ঢুকছে। তবু, মাথাটা তো বাঁচুক!

ভিতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে গায়ের পিরানটা সে খুলে ফেলল, নিংড়ে নিয়ে তাই দিয়ে মাথাটা মুছবে। কে জানে, আজ রাত্রিটা তাকে এখানেই কাটাতে হবে কিনা। ভয় করবে বই কি, ভয় বিলক্ষণ করবে। সাপ আছে, ভূত আছে, ভয় করবে না?

হঠাৎ রামসুখের চোখ ছানাবড়া। ঘুরঘুট্টি আঁধার মন্দিরের পিছন দিকটাতে, সেই আঁধারের ভিতর ঐ আগুনের ফুট্‌কিগুলো জ্বলে কী কারণে? কিসের আগুন

ও ? আলেয়া না কি ? আলেয়া তো বিলে, জলায়, নাবাল মাঠেই জ্বলে বলে জানা আছে রামসুখের। মন্দিরের ভিতরে তা জ্বলবে কেন ? হলই বা মন্দির ভাংগা, আলেয়া জ্বলবার মতো জায়গা তো এটা নিশ্চয় নয়!

ভয় তো বটেই। ভূত, অন্য কিছু হলেও ভয়। আগুনটার কারণ বোঝা যাচ্ছে না বলেই ভয়। মানুষের জ্বালানো আগুন কি অমন পেন্‌সিলের মতো সরুপানা হতে পারে ? লম্বাও নয় পেন্‌সিলের মতো। এ যেন ধূপকাঠির মাথার আগুনের ফুটকি এক একটা! হ্যাঁ, তা অনেকগুলোই জ্বলছে তো! এক, দুই, তিন, চার–

"ওরে, ঘরে অন্য কেউ ঢুকেছে রে!"

চাপা-গলারই কথা, কিন্তু রামসুখোয়া তা পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে। গায়ের পিরানটা নতুন করে নিংড়ে তাতে একবার ঝাড়া দিয়েছিল, সেই শব্দেই সচকিত হয়ে উঠেছে ঐ কণ্ঠস্বরের মালিকটা।

চকিতে পাঁচটা আগুনের ফুটকিই নিবে গেল, তার বদলে জ্বলে উঠল একটা জোরালো টর্চ। ফুটকিগুলো ছিল সিগারেটের আগুন। মেজেতে ঘষে সব নিবিয়ে দিয়েছে ধূম্রপায়ীরা।

টর্চের আলো ঠিক রামসুখের উপরে। সে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছে চট করে। "তুম কৌন হ্যায় রে ?" প্রশ্নকারী গলাটা যথাসম্ভব কর্কশ করারই চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তবু তার স্বাভাবিক কোমলতা সে চাপতে পারেনি কোনমতেই। সেই স্বর শুনেই রামসুখের মনে হলো, এ স্বর যার, সে ভূত তো হতেই পারে না, এমন কি ডাকুও না। তার পান্‌শাইয়ের চেয়েও মিষ্টি গলা এর (অবশ্য অংক না কষে নিয়ে গেলে পান্‌শাইয়ের গলা আলাদা রকম হয়ে যায়, কিন্তু সে তো আলাদা কথাই–)

সে এক পায়ে দুই পায়ে গিয়ে অপরিচিত ধূম্রপায়ীদের কাছে দাঁড়ালো। নিজে সে এ-সময়ে কী করে এখানে এসে পড়েছে, বলল তাও। তারপর একান্ত আচম্‌কা, নিতান্ত নির্দোষ ভাবে একটা প্রশ্ন করে বসল–"আপ্ লোগ স্বদেশীওয়ালা ? যেইসা রহা ভগৎ সিংজী ?"

"কাহে ? কাহে ? ইয়ে বাৎ কাহে কো পুছতা ?" সংশয় আর হাসি একসাথে মিশে আছে প্রশ্নে।

আবার সেই পান্‌শাইয়ের কথা এসে পড়ল। তিনি একটি প্রচ্ছন্ন সন্ত্রাসবাদী। লেখাপড়া তিনি শেখান বই কি! যথাসম্ভব শেখান। কিন্তু তার চেয়েও বেশী শেখান ছেলেদের, দেশের কথা। কাজেই রামসুখোয়ার মতো বারো বছরের চাষীর ছেলেও ইংরেজ সরকারের অত্যাচার, আর সেই সরকারের উচ্ছেদকল্পে ভগৎ সিং-প্রমুখ পাঞ্জাবী, আর রাসবিহারী-প্রমুখ বাংগালী মুক্তিযোদ্ধাদের আপ্রাণ চেষ্টার অনেক কথাই জানে।

ধূম্রপায়ীরা এই সরল গ্রাম্য বালকের কাছে স্বীকারই করল যে তারা বাংগালী সন্ত্রাসবাদী, আজই রাত্রে নিকটবর্তী এক ধনীর বাড়িতে কাজ আছে তাদের—

"কাজ ? কাজ মানে তো ডাকাতি ?"

হেসে উঠল ওরা সবাই, তারপর হুঁশিয়ার করে দিল ওকে–"তুই যদি একথা কাকপক্ষীকেও বলবি ভাই, তা হলে আমরা কিন্তু ফাঁসী যাব।"

"ভাই বাহাদুর, জান দেংগে, লেকিন—"

হঠাৎ ঝড়ের গর্জন, বাদলার ঝমঝম, সব ছাপিয়ে ভারী বুটের আওয়াজ, অনেকগুলো বুটের আওয়াজ, ভাংগা মন্দিরটাকে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত করে তুলল একেবারে। ধূম্রপায়ীরা লাফিয়ে উঠল "বন্দে মাতরম্" রব তুলে, গুড়ুম গুম্ পিস্তল চলতে লাগল এলোপাথাড়ি।

সন্ত্রাসবাদীরাও মরল কিছু, পুলিশও মরল কিছু। সব শেষে হতাহতদের পুলিশ ট্রাকে তুলে নিয়ে সার্জেন্ট হরজিৎ সিং চলে গেল ছাপরা সদরে। নিয়ে গেল বারো বছরের চাষী ছেলে রামসুখোয়াকেও। তারও আঘাত লেগেছে, তবে সামান্য। একখানা পা খোঁড়া হওয়া ছাড়া অন্য কোনো ক্ষতি তার হবে না, চিকিৎসা হলে।

সুচিকিৎসার সব আশ্বাস পুলিশ দিল, অনেক পুরস্কারের লোভও দেখাল রামসুখকে। কিন্তু সে না দিল নিজের পরিচয়, না জবাব দিল পুলিশের কোনো প্রশ্নের। অবশ্য সন্ত্রাসবাদীদের সম্বন্ধে সে জানতই বা কী! তবু সে মুখ খুলল না একটিবারও, কী-জানি বেফাঁস কোন্ কথা কোন্ ফাঁকে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়! অনন্ত, মাধব কয়েকটা নাম সে শুনে ফেলেছিল ওদের। সে-সব নাম সে প্রাণ গেলেও প্রকাশ করবে না।

পুলিশ যেমন পিটোতে লাগল হতাবশেষ সন্ত্রাসবাদীদের, তেমনি পিটোতে লাগল রামসুখোয়াকে। মার খেতে খেতে একসময় মারাই গেল অভাগা! পান্‌শাই একদিন সদাসুখকে ডেকে বললেন–"রামসুখ মারা গিয়েছে, তাকে পুড়িয়েও ফেলেছে পুলিশ। কিন্তু তুমি যদি হৈ-চৈ করতে চাও তা নিয়ে, তুমি নিজেও মারা পড়বে।"

সদাসুখ চেপে গেল একদম। "ছেলেটা ?"–কেউ রামসুখের খবর জানতে চাইলেই সে জবাব দিতে লাগল, "ছেলেটা মামাবাড়ি গিয়েছে। থাকবে কিছুদিন।"

ছবি : প্রসাদ রায়

দুখীরাম-শান্তিরাম

মণিলাল মুখোপাধ্যায়

বেচারা দুখীরামের কত না দুঃখ। অনেক চেষ্টা করেও একটা ভূত ধরতে পারল না। অমাবস্যা রাতে, মাথার ওপর মাছ ধরার খাঁচা চাপিয়ে, পিঠে তাপ্পি দেওয়া বস্তা ফেলে শ্মশানে-মশানে ঘুরেছে। ভূতের দেখা পায়নি যে তা নয়, কিন্তু যেই না পোলো চাপতে গেছে অমনি ভ্যানিশ্। শেষে চোঁচা গিয়ে বাপের পায়ে ঢিপ করে একটা পেন্নাম ঠুকে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়াল।

বাপ শুধোল, কোথায় যাচ্ছিস রে, দুখো?

দুখীরাম বলল, ভূত কিনতে।

বাপের চোখ ছানাবড়া। বলে কি ছোঁড়া! ভূতও কি হাটে কেনাবেচা হয় না কি!

কোন হাটে যাবি রে?

তেপান্তরের হাটে। আমতলা, জামতলা, বাঁশতলা, শিলচর, নীলচর, তেপান্তর।

ছেলের কথা শুনে মা কাটা কলাগাছের মতো ধপাস করে পড়ল মাটিতে।

কথা গেল অনেকের কানে। কেউ খেল ভিরমি, কেউ ছুটল ঠাকুরঘরে। দুখীরাম গেল তেপান্তরে, ভূত আনবে বস্তা ভরে।

পাকা তিন মাস, তিন দিন, তিন ঘন্টা পরে দুখীরাম দেশে ফেরে।

গাঁয়ে ঢোকার আগে যে বড় তেঁতুল গাছ আছে তার নিচে বস্তাটা নামিয়ে দুখীরাম ডাকে, শান্তিরাম।

বস্তার ভেতর থেকে খোনা গলায় উত্তর আসে, ইয়েস স্যার।

দুখীরাম চোখ বড় বড় করে বলে, ভূতো মিঞার কান্ড দেখ। চাইলাম এক, দিল আর এক। দেখাল কমলালেবু, দিল গোঁড়ালেবু। বললাম বাঙালি ভূত দাও। এ যে দেখি বিলিতি জিনিস।

শান্তিরাম বলে, না, স্যার। আমি ভেজালের জিনিস।

ঠিক আছে। শোনো, তুমি লাফ দিতে পার?

হ্যাঁ।

বস্তার বাইরে এসে চট্ করে একটা লাফ দাও।

এসেছি, স্যার।

এক লাফে ঐ তেঁতুল গাছের মগডালে উঠে পড় দেখি।

বলেন কি স্যার! এত বড় লাফ কি দেওয়া যায়?

সে কি! ভূত এক লাফে একতলা থেকে দশতলায় ওঠে, আর তুমি বলছ–

আজ্ঞে ভূতের বাপ তো কোন ছার, ঠাকুর্দাও অত বড় লাফ দিতে পারবে না।

ঠিক আছে, ভয় দেখাও তো দেখি।

শূন্যে একটা মাথা ভেসে উঠল। এটা শান্তিরামের। চোখ-মুখ বিকৃত করে সে ভয় দেখাল। দুখীরাম রেগে গেল।

এ রকম করে তো মানুষ ভয় দেখায়। একগাদা টাকা দিয়ে ভূত কিনতে যাব কেন?

আজ্ঞে মানুষ মরেই তো ভূত হয়।

ঠিক আছে, এখান থেকে হাত বাড়িয়ে বাড়ির লেবুগাছ থেকে একটা লেবু তুলে আনো।

ওরে বাবারে! অত দূরে কি হাত যায়!

তাহলে তুমি পারবেটা কি শুনি?

ডিগবাজি খেতে পারি, গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসতে পারি।

আর কি পারো?

খেতে পারি, শুতে পারি, কারও ভাল দেখলে সইতে নারি।

ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! কয়লা ধুলে ময়লা যায় না। ম'লেও স্বভাব যায় না। আমি এখন কি করি।

দুখীরামের দুঃখ আর যায় না। গালে হাত দিয়ে ভাবে আর ভাবে। এক সময় সূয্যি ডোবে। দুখীরাম বলে, শান্তিরাম, তুমি আমার পিছু পিছু এসো।

বাড়ি ফিরল দুখীরাম। হাঁফ ছাড়ল তার মা-বাপ।

মা বলে, চেহারার কি ছিরি হয়েছে। ঠিক যেন ভূত।

বাপ বলে, যাক, তোর ঘাড় থেকে ভূত নেমেছে তাহলে।

শান্তিরাম দুখীরামের কানে কানে বলল, আমি কোথায় থাকব, স্যার?

দুখীরাম বলল, তুমি ঐ বেলগাছটাতে থাকো।

দুখীরামের মা বলে, আমি বেলগাছে থাকব! অ দুখো, বলছিস কি?

শান্তিরাম বলল, বেলগাছে বড় বড় কাঁটা। ওখানে থাকতে পারব না স্যার।

সে কি! চিরকালই তো শুনেছি ভূত বেল গাছ শেওড়া গাছে থাকে।

দুখীরামের বাবা বলে, তোর ঘাড় থেকে এখনও ভূত নামেনি দেখছি।

শান্তিরাম বলল, একটা ঘর হবে না, স্যার?

দুখীরাম বলে, তুমি আমার ঘরে থেকো।

ঘুমোলে আপনার নাক ডাকে না তো?

আমি তো শুনিনি। সবাই বলে ডাকে।

তাহলে স্যার আমি শুতে পারব না। কারও নাক ডাকলে আমার ঘুম হয় না।

বল কি! রাতে ভূতেরা ঘুমোয় নাকি! রাতেই তো ভয় দেখায় ভূতে।

সব বাজে কথা স্যার। তবে রাতে চোর-ছ্যাঁচড় বেড়ায় ঠিকই।

তুমি তাহলে ঐ গোয়াল ঘরে থাকবে।

দুখীরামের বাবা বলে, আমি থাকব গোয়াল ঘরে?

শান্তিরাম বলে, গোয়াল ঘরে থাকব?

দুখীরাম রেগে গিয়ে বলে, হ্যাঁ, গোয়াল ঘরে থাকবে। বেটা যেন লাটসাহেব।

বলেই দুখীরাম ঘরে ঢোকে। এদিকে কষ্টে বাপের বুক ফাটে। ছেলেটার কি হলো কে জানে।

মা বলে, বলি অ দুখোর বাবা, দুখো কার সঙ্গে কথা বলছিল গা?

বাপ বলে, সর্বনাশ হয়েছে। দুখো ভূত ধরতে গিয়েছিল। দেখছি ভূতেই ওকে ধরেছে।

এ্যাঁ! এখন কি হবে?

চেঁচামেচি কর না। আমি লোকমান ওঝাকে খবর দিচ্ছি।

রাত গেল। সকাল এল। দুখীরামের ঘুম ভাঙল। ভাঙতেই সবকিছু মনে পড়ে, আর তখনই দুখীরাম ছোটে গোয়াল ঘরে।

শান্তিরাম–

ওপরে ঘুঁটের মাচা মড়মড় করে ওঠে, ঘুমটা মাটি করে দিলেন, স্যার!

তুমি ওখানে!

কি করব, স্যার। নিচে শুয়েছিলাম। সবে তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় ঐ পাঁঠাটা আমার গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। একটু পরে দেখি আমার নাকটা জিব দিয়ে চাটছে। রাগের চোটে যেই কানটা ধরে মাথাটা সরাতে গেছি অমনি কোমরে এমন গুঁতো লাগাল যে আধ ঘণ্টা নড়তে পারিনি। এরপর

শীগগির পালা আমি ভেনা দুলের চেলা।

ওটাকে যেই তাড়াতে যাই–ও তেড়ে আসে। সারারাত ছুটোছুটি করে শেষে এই ওপরে উঠে এলাম।

ঠিক এইসময় লোকমান ওঝা বাড়িতে পা দিয়েই চিৎকার করে উঠল, ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানো, তালগাছ, বেলগাছ, নিমগাছ–যেখানে থাকিস যা-যা-যা–। শীগাগর পালা। আমি ভেনা দুলের চেলা। যেই হোস, রক্ষে নেই।

ঘর থেকে দুখীর মা-বাবা বেরোল, গোয়াল থেকে বেরোল দুখীরাম। পাশে দাঁড়াল শান্তিরাম। দাঁড়ালে হবে কি, তাকে তো আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

লোকটাকে দেখে শান্তিরামের হাসি আর থামে না।

দুখীরামের বাবা ছেলেকে দেখিয়ে বলে, এই আমার ছেলে। ওকেই ভূতে পেয়েছে চাচা। তুমি ওকে বাঁচাও।

লোকমান ওঝা বলে, আমি যখন এসে গেছি তখন আর ভয় কি।

শান্তিরাম দুখীরামের কানে কানে বলল, স্যার, লোকটা কে?

দুখীরাম বলল, ওঝা। বাবা ডেকে এনেছে। ভেবেছে আমায় ভূতে ধরেছে।

দুখীরামের বাবা বলল, ঐ দেখ চাচা। কার সংগে কথা বলছে।

লোকমান ওঝা বলল, কাঁটা সমেত একটা মোটা বাবলা ডাল দরকার।

দুখীরামের বাবা তা এনে দিল। লোকমান ওঝা সেটা নিয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র বলে দুখীরামের দিকে এগোতে লাগল।

ভয়ে দুখীরামের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয় আর কি।

শান্তিরাম, বাঁ-চা-ও–বলে দুখীরাম।

লোকমান বলে, কারও ক্ষমতা নেই তোকে বাঁচায়।

লোকমান ওঝা বাবলার ডাল নিয়ে তেড়ে যেতেই দুখীরাম বাড়ির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে যায় আর বলে, শান্তিরাম, বাঁচাও।

শান্তিরাম বলে, ওরে বাবা। ঐ ডালটার এক ঘা খেলে আমার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটবে, স্যার।

ওঝা তেড়ে যায়। দুখীরাম পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

শান্তিরাম, ওঝাকে ধর।

পারব না, স্যার। বাবলার কাঁটা ফুটলে টিটেনাস হবে।

তুমি বাবলা-কাঁটাকে ভয় খাচ্ছ?

লোকমান বলে, ভয় খাবে বইকি। এরপর যদি না ছাড়ে তো খেজুর কাঁটা আনব।

শান্তিরাম বলল, ঠিক আছে। ওঝাকে মজা দেখাচ্ছি।

এরপর শান্তিরাম লোকমান ওঝার পিছনে গিয়ে কাতুকুতু লাগাতেই সে ডাল ছেড়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। তারপর ধুলোয় গড়াগড়ি আর হাসি। হাসি আর গড়াগড়ি।

দুখীরামের মা বলে, ওঝাকেও ভূতে ধরে!

দুখীরামের বাবা বলে, চাচা মনে হচ্ছে পাহাড়ী ভূত।

লোকমান বলে, বেয়াড়া ভূত। কাতুকুতু দিচ্ছে।

এরপর লোকমান কোনোরকমে উঠেই চোঁচা দৌড়।

দুখীরামের বাপ বলে, ভূতের কি হবে চাচা?

গুরুকে পাঠিয়ে দেব, ছুটতে ছুটতে বলে লোকমান।

ছবি : দিলীপ দাশ

টুকটুক

প্রিয়রঞ্জন মৈত্র

তখন গভীর রাত। চারদিক নিস্তব্ধ। 'শান্তির আলয়' নামে বাড়িটার সকলেই ঘুমিয়ে। এমন কি দোতলায় বারান্দার খাঁচার পোষা টিয়াটাও।

পাঁচিল টপকে দু'জন লোক ঢুকল 'শান্তির আলয়ে'। সিঁড়ির দরজা বন্ধ দেখে জলের পাইপ বেয়ে তারা উঠল দোতলায়। নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল বাড়ির বড় ছেলে খোকার ঘরের সামনে। দরজায় কান পাতল তারা। না, কোনো শব্দ নেই। এবার দরজার একদিকে চাপ দিয়ে একটা পাতলা লোহার পাত ঢুকিয়ে দিল একজন। একটু চেষ্টা করতেই খিলটা খুলে গেল। আর ঠিক সেই সময়ই ঘুম ভেঙে গেল টিয়াটার। সে হঠাৎ চিৎকার শুরু করল–

–খোঁকা চোঁর, খোঁকা চোঁর–চোঁর–

ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোক দুটো। একজন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে খাঁচার দরজাটা খুলে হাত ঢুকিয়ে দিল। উদ্দেশ্য, টিয়াটার গলাটা মুচড়ে ধরে শেষ করে দেওয়া।

লোকটার উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হলো না টিয়াটার, খাঁচার মধ্যে ঝটফট করতে করতে ঠোকরাতে শুরু করল লোকটার হাতটাকে।

টিয়ার চিৎকার ও ঝটফটানির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল খোকার। সেই সংগে চাকর বলরামেরও। ওরা ছুটে এসে জাপটে ধরল একজনকে। আর একজন তখনকার মতো পালাল বটে, তবে ধরা পড়ল একদিন বাদেই।

সেদিন যদি টিয়াটা ওইভাবে না ডাকতো, তাহলে বেশ বড় রকমের একটা চুরি হয়ে যেত 'শান্তির আলয়ে'। কারণ সেদিনই বোনের বিয়ের জন্য স্যাকরার কাছ থেকে গয়না নিয়ে এসেছিল খোকা।

এই কাহিনীটা গল্প নয়, সত্যি। এই রকম হয়তো অনেক কাহিনী তোমরাও জানো, শুনেছো। সামান্য পাখি যে কত রকমভাবে মানুষের উপকার করে এই কাহিনীগুলো তারই প্রমাণ।

আজ তোমাদের আর একটা সামান্য পাখির অসামান্য কাহিনী শোনাব। যে কাহিনীটা অনেকদিন আগের হলেও এখনো সকলকে অবাক করে।

অনেক-অনেকদিন আগের কথা। তখন সুন্দরপুরের রাজা ছিলেন বিক্রম। রানী দয়াবতী। তাঁদের সন্তান ছিল না। কিন্তু ছিল একটা ময়না। নাম তার টুকটুক। টুকটুককে সন্তানের মতোই ভালবাসতেন তাঁরা। অবশ্য

তোকে কি কেউ আটকে রেখেছিল টুকটুক ?

তার কারণ ছিল। কারণটা হচ্ছে টুকটুক পাখি হলেও তার বুদ্ধি ছিল দারুণ। রাজা-রানীর অল্প চেষ্টাতেই সে কথা বলতে শিখেছিল ঠিক মানুষের মতো। কথাগুলো ছিল খুব মিষ্টি। রাজা-রানীর সঙ্গে অনেক কথা বলত সে। তার সোনার খাঁচার দরজাটা খোলাই থাকত। সারাদিন সে রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঘুরে বেড়াত, উড়ে বেড়াত। একমাত্র ঘুমের সময় ছাড়া খাঁচায় ঢুকত না। মানুষের মধ্যে এক একজন জ্ঞান বুদ্ধিতে যেমন অসাধারণ হয় পাখিদের মধ্যে টুকটুকও ছিল তেমনি।

বিক্রম তখন সুন্দরপুরের রাজা ছিলেন বটে তবে রাজ-কার্য বলতে যা বোঝায় তা তিনি করতেন না। পাশা খেলে, শিকার করে দিন কাটাতেন প্রায়। রাজকার্য চালাতেন তাঁর মন্ত্রী জটিলেশ্বর। এই জটিলেশ্বরকে বিক্রম খুবই বিশ্বাস করতেন।

কিন্তু জটিলেশ্বর ছিল ধূর্ত আর অত্যাচারী। কারণে-অকারণে সে প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে অর্থ আদায় করত এবং সেই অর্থ সবটা রাজভাণ্ডারে জমা না দিয়ে বেশির ভাগটাই নিজের কাছে রেখে দিত। সে মনে মনে ঠিক করেছিল সুযোগ বুঝে বিক্রমকে তাড়িয়ে নিজে রাজা হবে।

রানী দয়াবতীর ছিল দয়ার শরীর। মনটা ছিল খুবই কোমল। কেউ দুঃখ পেলে তাঁরও দুঃখ হতো। তিনি একদিন তাঁর এক দাসীর কাছ থেকে জটিলেশ্বরের অত্যাচার এবং তার পরিকল্পনার কথা জানতে পারলেন। জেনে একদিকে যেমন তাঁর দুঃখ হলো অন্যদিকে দুশ্চিন্তা হতে লাগল। ভাবতে লাগলেন কী ভাবে রাজাকে সব বলবেন। শুধু বললেই তো হলো না, রাজাকে প্রমাণ দিয়ে বিশ্বাস করাতে হবে। কারণ জটিলেশ্বরকে রাজা যতটা বিশ্বাস করেন আর কাউকেই তেমন বিশ্বাস করেন না।

খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে দিন কাটতে লাগল রানীর। মনে তাঁর একটুও শান্তি নেই।

টুকটুক লক্ষ্য করছিল রানী কথা বলা কমিয়ে দিয়েছেন। আগের মতো আদর-যত্নও তেমন করেন না তাকে। সারাদিন শুধু গালে হাত দিয়ে বসে থাকেন।

একদিন রাজা যখন হাতির পিঠে চেপে শিকারে বেরিয়ে গেলেন তখন টুকটুক গিয়ে বসল রানীর কাছে। রানীকে বলল, রানীমা, তোমার কী হয়েছে বল তো ? তুমি সারাদিন মুখ ভার করে বসে থাকো কেন ? কী হয়েছে তোমার ?

রানী বললেন, টুকটুক, খুব বিপদ আমাদের।

টুকটুক বলল, কী বিপদ রানীমা ?

রানী বললেন, তুই শুনে কী করবি ? তাছাড়া তোর কাছ থেকে অন্য কেউ শুনলে খুবই খারাপ হবে।

রানীর কথা শুনে টুকটুকের খুব দুঃখ হলো। সে বলল, আমায় তুমি বিশ্বাস কর না রানীমা ! এই কথা বলে সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল।

রানী বুঝলেন, হঠাৎ ব্যথা দিয়ে ফেলেছেন টুকটুকের মনে। তিনি ধীরে ধীরে মন্ত্রীর অত্যাচার এবং পরিকল্পনার কথা বললেন টুকটুককে। সেই সঙ্গে বললেন রাজাকে জানানোর অসুবিধাটাও।

টুকটুক মন দিয়ে শুনল সব। কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, তুমি ভেবো না রানীমা। আমি নিজে ভাল করে জেনে সব ব্যবস্থা করব। এই বলে উড়ে গেল সে।

এক দিন, দু'দিন, তিন দিন গেল, টুকটুক ফিরল না। এদিকে রাজা শিকার থেকে ফিরে এলেন। টুকটুককে রাজপ্রাসাদে না দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল তাঁর। কেউই টুকটুকের কথা বলতে পারল না। টুকটুককে খুঁজে আনার জন্য রাজা যখন চারদিকে লোক পাঠাবেন ভাবছেন, ঠিক সেই সময় ফিরে এলো টুকটুক। এই কদিনে টুকটুক যেন একটু রোগা হয়ে গেছে।

রাজা তো খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাকে দেখে। তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন, তোকে কি কেউ আটকে রেখেছিল টুকটুক ? তার কী নাম বল। এখুনি তার গর্দান নেব।

টুকটুক বলল, আমাকে কেউ আটকে রাখেনি রাজামশায়। আমি চুপিচুপি দেখতে গিয়েছিলাম আপনার রাজত্বে প্রজারা কেমন আছে।

রাজা বললেন, কেমন দেখলি ? প্রজারা খুব সুখে আছে তো ?

টুকটুক একটু চুপ করে থেকে বলল, যা দেখেছি তা বলতে আমার দুঃখ হচ্ছে, লজ্জা হচ্ছে। আপনার মতো মহানুভব রাজার রাজত্বে প্রজারা এমন দুঃখকষ্টে থাকবে আমি ভাবতেও পারিনি।

রাজা অবাক হয়ে বললেন, কী বলছিস টুকটুক ! মন্ত্রী যে বলে সবাই খুব সুখে আছে। তবে কি সে মিথ্যে বলে ?

সেদিন রাতেই ভিখারীর ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়লেন রাজা।

টুকটুক বলল, তিনি যা-ই বলুন না কেন, কারো কথার ওপর নির্ভর না করে ছদ্মবেশে আপনি নিজেই যদি প্রজাদের কাছে যান তাহলেই সব জানতে পারবেন।

টুকটুকের কথামতো সেদিন রাতেই ভিখারীর ছদ্মবেশে রাজবাড়ির গুপ্ত দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রাজা। শুধু একদিন নয়, পরপর বেশ কয়েকদিন ভিখারী সেজে ঘুরে বেড়ালেন তিনি।

ধীরে ধীরে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে। তিনি মন্ত্রীর অত্যাচারের কথা জানতে পারলেন প্রজাদের কাছ থেকে। আর রানীর কাছ থেকে জানলেন মন্ত্রীর পরিকল্পনার কথা।

এরপর একদিন মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে প্রজাদের সামনেই তার বিচার করলেন এবং নির্বাসন দণ্ড দিলেন রাজা। আর টুকটুকের উপকারের কথা প্রচার করে দিলেন রাজ্যময়। প্রজারা জানল টুকটুক কী ভাবে রাজার এবং সকলের উপকার করেছে।

তারপর থেকে সুন্দরপুরের সকলে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

[ইতালির উপকথার ছায়া অবলম্বনে]

ছবি–দিলীপ দাশ

গুপ্তধনের সন্ধানে (পূর্ব প্রকাশিতের পর) —হেমেন্দ্রকুমার রায়

সে গুহায় যা আছে বোধহয় কুবেরের ভাণ্ডারেও তা নেই। কিন্তু সে গুহা হচ্ছে ভুতুড়ে-গুহা। আমার সঙ্গীরা সবাই মারা পড়েছে। একটা বাক্স নিয়ে কোন-গতিকে আমি আর ঘটোৎকচ প্রাণ নিয়ে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু গুপ্তধন আমার ভোগে লাগল না। বিশ্বাস ঘাতক ঘটোৎকচ — ওঃ! ওঃ!

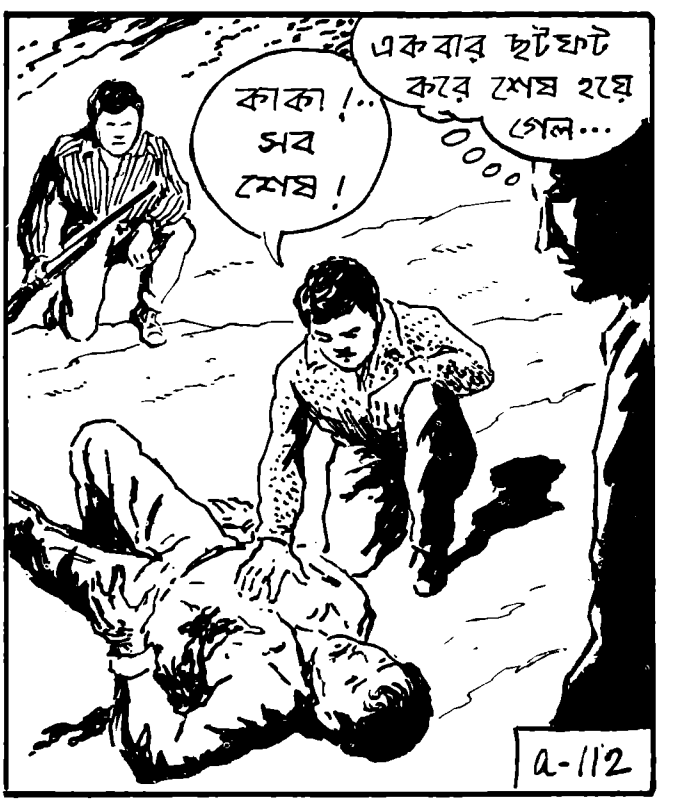

[চলবে]

পাথরের চোখ

শিশির বিশ্বাস

অফিসের কাজের ব্যাপারে যাচ্ছিলাম কাঞ্চিপুরম। এই লাইনটায় সারা বছরই ভিড় খুব বেশি। সেদিন কিন্তু মামবালম থেকে ট্রেনে উঠে বেশ অবাক হয়ে গেলাম। ছোট্ট কামরাটায় যাত্রী বলতে মাত্র আর একজন। লালমুখো এক ইউরোপীয়ান।

পুরোনো দিনের বইপত্রে দেখি সাহেবদের চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখকরা 'জাঁদরেল' বিশেষণটি প্রায় সব ক্ষেত্রেই জুড়ে দিয়েছেন। একালে সে সব সাহেবদের দেখা আর প্রায় মেলে না। তবুও গোড়ায় ভদ্রলোককে কিছু ব্যতিক্রমই মনে হয়েছিল। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কপালে ভাঁজ পড়েছে গোটাকয়েক। নিখুঁত পোশাক-পরিচ্ছদ। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে। ভদ্রলোকের চোখে গাঢ় রঙের একটা সানগ্লাস।

হাতে বেশ মোটাসোটা একটা বই নিয়ে নিবিষ্ট মনে পড়ছেন। আমার পায়ের শব্দে ভদ্রলোক মাথা সামান্য তুলেই ফের বইয়ের ভেতর ডুবে গেলেন। আমিও সুবিধামত একটা জায়গা দেখে বসে পড়লাম।

ট্রেনে উঠে গুছিয়ে একটু বসতে পারলে আমার ঘুম পায়। বোধহয় ট্রেন তখনো গুমটি পেরোয়নি। জানলার ধারে বসে যথারীতি ঢুলতে শুরু করেছি। হঠাৎ ছোট্ট একটু ঝাঁকুনিতে চোখ মেলে দেখি সেই ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক ইতিমধ্যে কখন জায়গা বদলে আমার উল্টো দিকে এসে বসেছেন। আমাকে চোখ মেলতে দেখে একটু উসখুস করে হঠাৎ ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে। গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে সামান্য ভাঙা ইংরেজীতে বললেন, হ্যালো মিঃ–তুমি কি হিন্দু? আই মিন তুমি কি দেবমন্দিরে যাও?

হঠাৎ ঐ প্রশ্ন করতে দেখে গোড়ায় একটু চমকেই গিয়েছিলাম। কিন্তু প্রশ্নের উদ্দেশ্যটি বুঝতে বিলম্ব হলো না। সাহেবের হাতের সেই মোটা বইটা ভেতরে আঙুল ঢোকানো অবস্থায় বন্ধ করা কভারটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে–'হিন্দু টেম্পলস্ অব সাউথ ইন্ডিয়া'। কোনো সন্দেহ নেই ভদ্রলোক ট্যুরিস্ট। কিংবা ভারতের মন্দির নিয়ে গবেষণা করতে এদেশে এসেছেন। আমি সামান্য মাথা দুলিয়ে ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দিলাম।

–কত মন্দিরে তুমি গিয়েছ? অনেক? মোর দেন থাউজ্যান্ড অর ল্যাখ?

গাঢ় সানগ্লাসের আড়ালে চোখের তারা অদৃশ্য।

কিন্তু গলার স্বর আর মুখের ভাঁজেই বোঝা যাচ্ছিল কী ভীষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে উত্তরটা জানতে চাইছেন ভদ্রলোক। অথচ এ প্রশ্নের কী জবাব দেব। সামান্য হেসে বললাম, এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া মুশকিল। তবে সাউথ ইন্ডিয়ার অনেক মন্দিরেই আমি গিয়েছি।

ভদ্রলোক এবার খানিকটা ঝুঁকে বসে বললেন, মিঃ তুমি এমন কোনো মন্দিরে গেছ যেখানে দেবমূর্তির একটা মাত্র চোখ .....

গোড়ায় প্রশ্নটা ঠিক ধরতে পারিনি। মাথা নেড়ে বললাম, না-না, তেমন কোনো মন্দিরে আমি যাইনি। আর তাছাড়া এক চোখওয়ালা কোনো দেবদেবী হিন্দুশাস্ত্রে আছে বলেও আমার জানা নেই।

প্রায় তৎক্ষণাৎ ভীষণ ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, নো-নো, আমি সে কথা বলছি না। মানে এমন কোনো দেবমূর্তি যার একটা চোখ খোয়া গেছে। আই মিন চুরি।

আমি মাথা নাড়লাম।

ভদ্রলোক একটু যেন নিরাশ হলেন। বললেন, ভাল করে মনে করে দ্যাখ তো। মন্দির ছাড়া অন্য কোথাও কোনো মিউজিয়াম, কিউরিও শপ অথবা কারুর ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে কিনা! আই মিন পুরোনো কালের অনেক দেবমূর্তিই তো এখন আর মন্দিরে নেই।

বলা বাহুল্য তেমন কোনো দেবমূর্তির খোঁজ আমার জানা ছিল না। কিন্তু এবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম না। ইতিমধ্যে আমার মনের ভেতরেও একটু কৌতূহল উঁকি মারতে শুরু করেছে। বললাম, হঠাৎ এমন একটা মূর্তির খোঁজ করছ কেন?

ভদ্রলোক বললেন, হঠাৎ নয় মিঃ। আজ দেড় বছর এদেশে এসেছি ঐ মূর্তিটির খোঁজে। প্রায় চষে ফেলেছি গোটা ভারতবর্ষ।

আমি একটু হেসে বললাম, ঐ রকম একটা দেবমূর্তি যে এদেশে থাকতে পারে তাই বা তুমি কি করে ভাবলে?

–আমি যে জানি এমন একটা দেবমূর্তি সত্যিই রয়েছে। আর সেই মূর্তিটির খোঁজ যে করে হোক আমাকে পেতেই হবে।–থামলেন ভদ্রলোক। বুঝলাম সানগ্লাসের আড়ালে উনি আমার ওপর এক পলক চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর ফের বলতে শুরু করলেন, তুমি তো হিন্দু। তুমি মন্দিরের দেবতার অভিশাপে বিশ্বাস কর?

আমি হ্যাঁ কিংবা না কোনো উত্তর দিলাম না। উনি আমার উত্তরের জন্য বিশেষ অপেক্ষাও করলেন না। বললেন, লিসবনের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারকে তোমাদের

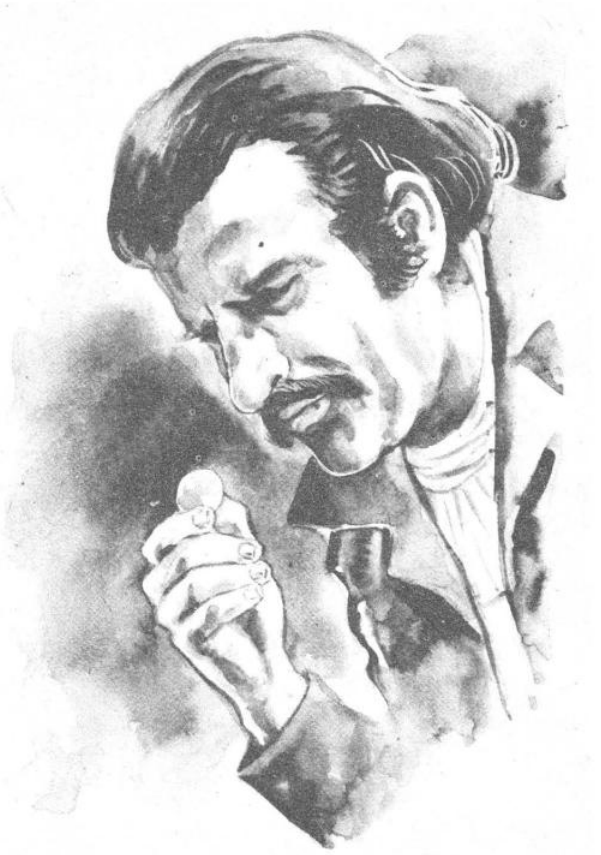

পাথরটা হাতে নিয়ে খানিক উল্টেপাল্টে দেখল।

দেবতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্যই ঐ বিশেষ দেবমূর্তি গত দেড় বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

অবাক হয়ে বললাম, হিন্দু দেবতার অভিশাপ আপনাদের ইউরোপীয়ানদের ওপর তো পড়ার কথা নয়। অবশ্য লিসবনের সেই পরিবারটি যদি হিন্দু হয় তো আলাদা কথা।

–নো মিঃ। লিসবনের বেনডিক্ট ডি-সুজা পরিবার গোঁড়া ক্যাথলিক। তবুও বিগত তিনশো বছর ধরে এক হিন্দু দেবতার অভিশাপ ডি-সুজা পরিবারকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আজ আট পুরুষ পরে এসেও রেহাই নেই কারুর। ভাবতে পার!

শুরু থেকেই মানুষটির কথাবার্তা কেমন প্রলাপের মতো শোনাচ্ছিল। এখন আর কোনো সন্দেহই রইল না, যে মন্দির দেবতার খোঁজে সাহেবের মাথাটাই গেছে।

বেশ বিনীত ভাবে বললাম, তা ডি-সুজা পরিবার কি এমন অপরাধ করেছিলেন, যে আট পুরুষ পরেও তাঁদের

ওপর অভিশাপের খাঁড়া ঝুলছে?

–অপরাধ করেছিলেন ম্যানুয়েল ডি-সুজা। বর্তমান বেনডিক্ট ডি-সুজার পূর্বপুরুষ। গোঁড়া ক্যাথলিক ম্যানুয়েল ডি-সুজা ব্যাপারটাকে আদৌ অপরাধ বলে ভাবেনি। সে সব তিনশো বছর আগের কথা। কোম্পানির আমলের একেবারে গোড়ার দিক। ইংরেজ আর ডাচদের পাশাপাশি পর্তুগিজরাও তখন ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যবসা মানে লুঠতরাজ। অবশ্য তাদের আগের মতো রমরমা দিন আর নেই। তবু মোটামুটি চলছে। ম্যানুয়েল ডি-সুজা এই সময়ই ভারতবর্ষে আসে।

এই পর্যন্ত বলে থামলেন উনি। মনে হলো সানগ্লাসের আড়ালে একবার ভাল করে দেখে নিলেন আমাকে। বোধহয় বুঝে নিতে চাইলেন গল্পটা আমি আদৌ শুনছি কিনা। তারপর ফের শুরু করলেন, ম্যানুয়েল ডি-সুজা এদেশে এসেছিলেন জাহাজের এক সামান্য খালাসী হিসেবে। কতই বা মাইনে–খাওয়া ছাড়া প্রতিমাসে পাঁচ কি সাত ক্রুসাডো। প্রতি ক্রুসাডোর বাজার দর সেকালে আড়াই শিলিংয়ের বেশি হতো না। এই সামান্য মাইনেয় কি কেউ আর দেশ ছেড়ে এতদূর আসে। সুতরাং বুঝতেই পারছ সকলের আসল লক্ষ্য ছিল উপরি পাওনার দিকে। অর্থাৎ লুঠতরাজ। যেখানে সে-ব্যাপারে সুবিধে হবে না সেখানে চুরিতেও এরা পেছপা হতো না।

ম্যানুয়েল ডি-সুজাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বছর আড়াই সে এদেশে ছিল। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই সোনাদানা মিলিয়ে সেকালের বাজারদরে বেশ কয়েক হাজার টাকা রোজগার করে ফেলেছিল। ম্যানুয়েল এই সময়েই এদেশে এক মন্দিরের খোঁজ পায়। মন্দিরে পাথরের দেবমূর্তির দু'চোখে নাকি দুটো হীরে বসানো আছে। খবরটা কানে যেতেই ম্যানুয়েলের চোখ দুটো লোভে চকচক করে ওঠে। দলবলসহ মন্দিরটা লুঠ করা সম্ভবতঃ কঠিন কিছু ছিল না। কিন্তু ম্যানুয়েল ভেবে দেখল তাতে হীরে দুটো ক্যাপটেনের দখলে চলে যাবে। ওদের কারুর ভাগেই জুটবে না। সুতরাং ম্যানুয়েল ঠিক করে ফেলল হীরে দুটো ও একাই একদিন চুরি করবে। খবরটা ও আর কারুকেই জানাল না।

অতঃপর দিন কয়েক বাদে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিয়ে এক রাত্তিরে গোপনে আস্তানা থেকে বেরিয়ে পড়ল ও। খোঁজখবর তো আগেই নেওয়া ছিল। পুরোহিতসহ মন্দিরের জনাকয়েক স্থায়ী বাসিন্দা মন্দিরের পাশে একটি ঘরে বাস করতো। রাত্তিরে জনাকয়েক প্রহরী মূল মন্দিরের সংলগ্ন নাটমন্দিরে ঘুমোতো। এছাড়া মন্দিরের ভেতর আর কেউ থাকতো না। সুতরাং এ ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়।

নাটমন্দিরের পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে ঘুমন্ত প্রহরীদের পাশ কাটিয়ে ম্যানুয়েল খুব সহজেই পৌঁছে গেল মূল মন্দিরের দরজায়। ভেজানো দরজা সামান্য ঠেলা দিতেই ক্যাঁচ করে সামান্য একটু শব্দ করে খুলে গেল। ভেতরে সিংহাসনের ওপর দেবমূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বলছে। ভেতরটায় আবছা আলো-আঁধারী পরিবেশ। সেই স্বল্প আলোয় দেবমূর্তির চোখের হীরে দুটো জ্বলজ্বল করছে। ঐ দেখে ম্যানুয়েল আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। সঙ্গে কয়েক রকমের লোহার ফলা, উকো ইত্যাদি নিয়ে এসেছিল। সেগুলো নিয়ে মুহূর্তে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো মূর্তিটার ওপর। সামান্য চেষ্টাতেই প্রায় পায়রার ডিমের আকৃতির বাঁ-চোখের পাথরটা খুলে ফেললে ম্যানুয়েল।

গণ্ডগোলটা হলো এর পরেই। তড়িঘড়ি করার জন্যেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক হঠাৎ পায়ে বেধে ধাতুর বড় পাত্র জাতীয় কিছু আচমকা ঝন্‌ঝন্ শব্দে উল্টে গেল। সেই শব্দে নাটমন্দিরের প্রহরীরা জেগে উঠে মুহূর্তে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হৈচৈ বাধিয়ে দিলে। সুতরাং বাকি পাথরটার আশা ত্যাগ করেই পালাতে হলো ম্যানুয়েলকে।

ব্যাপারটা দলের কারুকেই আর বলেনি ম্যানুয়েল। পাথরটা ও লুকিয়ে রেখেছিল জাহাজের এক গোপন স্থানে। মূর্তির অপর চোখটা চুরি করার সাহস আর হয়নি। যাই হোক, এর মাস কয়েক বাদেই ওদের জাহাজ দেশের পথ ধরল।

দেশে ফিরে আর সকলের মতো ম্যানুয়েলেরও দিন ফিরে গেল। লুঠের জিনিসপত্রের কিছু অংশ বিক্রি করে ছোটখাটো একটা জমিদারি কিনে ফেললো। তবে মন্দির থেকে চুরি করা পাথরটাই সবচেয়ে বেশি নিরাশ করেছিল তাকে। এক জহুরীকে দিয়ে দেখাতে জানতে পারল পাথরটা আদপে হীরেই নয়। খুব ভাল ধরনের জার্কন। বাজারদর খুব সামান্যই। পাথরটা আর বিক্রি করেনি ম্যানুয়েল। যে জিনিস সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রাণ যেতে বসেছিল তা অত সস্তায় বিক্রি করতে মন চায়নি। বিশেষতঃ অর্থের যখন তার অভাব নেই। নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল সে।

কিন্তু ডি-সুজা পরিবারে অঘটন শুরু হলো এর পর থেকেই। অঘটন কেন, এক-রকম বিপর্যয়ই বলা যেতে

পারে। বছর কয়েক বাদে ম্যানুয়েলের এক মাত্র পুত্র এ্যান্টনির জন্ম হয়। জন্মের পরই দেখা গেল নবজাতকের বাঁ চোখে কোনো আইবল নেই। সাধারণতঃ এমনটি দেখা যায় না। অন্ধ হয়ে অনেকেই জন্মায়; কিন্তু আইবলহীন অবস্থায় কোনো শিশুর জন্ম হয়েছে বলে শোনা যায়নি। যাই হোক ঘটনাটাকে নিছক একটা অ্যাকসিডেন্ট বলেই সকলে মেনে নিয়েছিল। ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হলো না। এর অনেক বছর বাদে এ্যান্টনির একমাত্র পুত্র ফ্রান্সিসের যখন জন্ম হয় দেখা গেল তারও বাঁ-চোখের আইবল নেই।

ব্যাপারটাকে এবার আর কেমন যেন নিছক কাকতালীয় বলে মেনে নিতে পারছিল না ম্যানুয়েল। তখন বয়স হয়েছে। দেহ-মনে আগের তেজ আর নেই। এক অজানা আশংকায় ভীষণ ভয় পেয়ে গেল সে। একদিন ছেলেকে একান্তে ডেকে তাকে পাথরের ব্যাপারটা খুলে বললে ম্যানুয়েল।

ছোটবেলা থেকেই এ্যান্টনি একটু অন্য রকমের। নিয়মিত চার্চে যায়। ধর্মভীরু মানুষ। অলৌকিক ব্যাপার স্যাপারে গভীর বিশ্বাস। বাবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে পাথরটা দেখতে চাইলে সে। সিন্দুকের এক কোণে অযত্নে পড়ে ছিল পাথরটা। খুঁজে পেতে সেটা বার করে দেখালো ম্যানুয়েল।

পাথরটা হাতে নিয়ে খানিক উল্টেপাল্টে দেখল। এ্যান্টনি খুব মনোযোগের সংগে পরীক্ষা করল সেটা। তারপর এক সময় মুখ তুলে বিষণ্ণ গলায় বলল, পাথরটার কথা তুমি আগে কেন বলনি বাবা?

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ভীষণ ঘাবড়ে গেল ম্যানুয়েল। বলল, কেন রে?

প্রত্যুত্তরে বিষণ্ণ একটু হাসল এ্যান্টনি। তারপর ম্যানুয়েলের সামনেই হঠাৎ এমন অদ্ভুত একটা কাজ করে বসল যা ম্যানুয়েল কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

এই ঘটনার পর ম্যানুয়েল আর বেশি দিন বাঁচেনি। মরার আগে বেচারা জেনে গিয়েছিল ওর বংশধরেরা কেউ আর বাঁচোখ নিয়ে জন্মাবে না।

ম্যানুয়েল মরে বাঁচল। ডি-সুজা পরিবারের পরবর্তী অবস্থা তাকে আর দেখে যেতে হয়নি। সেটা দেখে গেল এ্যান্টনি। ওর ছেলে ফ্রান্সিসের কর্মক্ষম ডানচোখটাও অন্ধ হয়ে গেল যৌবনেই। আর পরবর্তী কয়েক জেনারেশান ধরে ডি-সুজা পরিবারে চলেছে এই একই ব্যাপার। ডি-সুজা পরিবারের বর্তমান উত্তরাধিকারী বেনডিক্টের দু'চোখই আজ অন্ধ। বেনডিক্ট আজও বিয়ে করেনি।

দেব সাহিত্য কুটীরের নবতম উপহার

ক্রাইম সিরিজ

রহস্য, রোমাঞ্চ, সন্ত্রাস, গুপ্তচর আর গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে রুদ্ধশ্বাস উপন্যাস। প্রতি মাসে একটি করে বেরুচ্ছে। প্রত্যেকটি বইয়ের দাম মাত্র সাত টাকা। লিখছেন

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

১৫ই অক্টোবর বেরিয়েছে

প্রবাল দ্বীপের বিভীষিকা

প্রশান্ত মহাসাগরের এক নির্জন দ্বীপে এক ভারতীয় সমুদ্রবিজ্ঞানীর মৃত্যু হলো। তারপর সাগরের ডুবন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত লাভা আর আগুনলাল ঢেউ-এর মধ্যে শুরু হলো গুপ্তধন উদ্ধারের লড়াই...হত্যা... গুম খুন! কোথায় লুকিয়ে আছে প্রবাল দ্বীপের ঐশ্বর্য?

১৫ই সেপ্টেম্বর বেরিয়েছে

মৃত্যুদূতের শেষ প্রহর

গুপ্তঘাতক দলের নেতা মৃত্যুদূত, ভারতবর্ষের চরম শত্রু। একটি লোক, যে বিদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে সেই শুধু জানে এই গুপ্তঘাতকের প্রকৃতি। মৃত্যুদূতের সবচেয়ে সাংঘাতিক চক্রান্তে সারা ভারত ওলোট পালোট হয়ে যাবে। এই চক্রান্তের খবর কানে এলো এক ভারতীয় এজেন্টের। মরণপণ সংগ্রামের জন্য তৈরী হল সে...

১৫ই আগস্ট বেরিয়েছে

অদৃশ্য কালোহাত

সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের একটি মিনিবাস আমস্টারডাম থেকে বম্বে আসছে। সেই বাসে লন্ডন-প্রবাসী দুই ভারতীয় ছাত্রী। গ্রীস, তুর্কী, আফগানিস্থান, বেলুচিস্তান হয়ে পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে মিনি বাসটি ক্রমশঃ ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে কোনো দুঃস্বপ্ন নিয়ে....?

এর আগে বেরিয়েছে **বুলেটের শিস**

উজ্জ্বল নীল মৃত্যু : উড়ন্ত বাজ : জ্বলন্ত আগুন

দেব সাহিত্য কুটীর : ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

ওখানে ওভাবে কী খুঁজছেন, এই তো আপনার সানগ্লাস।

ওর সুদৃঢ় বিশ্বাস দেবমূর্তির বাঁ চোখের সেই পাথরটা যথাস্থানে ফিরিয়ে না দিলে ওদের বংশ অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে না। পাথরটা আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। গত দেড়বছর ধরে ভারতবর্ষের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখনো সেই দেবমূর্তির খোঁজ পাইনি।

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে থামলেন ভদ্রলোক। তারপর হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, চিঙ্গেলপুট বোধ হয় এসে গেল। তাই না মিঃ ?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝলাম সময় অনুযায়ী গাড়ি চিঙ্গেলপুটেই আসছে। গল্পের ঝোঁকে কোথা দিয়ে যে সময় পেরিয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। মাথা নেড়ে জানালাম হ্যাঁ চিঙ্গেলপুটই আসছে।

শুনে উান বললেন, আমি চিঙ্গেলপুটেই নামব। উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে মুখটা মুছতে মুছতে সামান্য নিচু হয়ে সিটে নামিয়ে রাখা বইটা তুলে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটল। ভদ্রলোক সবে সিট থেকে বাঁ-হাতে মোটাসোটা বইটা তুলেছেন; হঠাৎ কোনো কারণে ট্রেনটা একটু ব্রেক কষল। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিলেন উনি। কোনোক্রমে টাল সামলে নিলেন। চোখ থেকে সানগ্লাসটা ছিটকে আমার কোলে এসে পড়ল; আর সেই সঙ্গে কিছু একটা ঠং করে মেঝেয় পড়ে গড়িয়ে গেল।

মুহূর্তে একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এল ভদ্রলোকের গলা দিয়ে, ওঃ গড, মাই আই–

তৎক্ষণাৎ মেঝের ওপর ঝুঁকে পড়ে সম্পূর্ণ অন্ধের মতো হাতড়ে কিছু একটা খুঁজতে লাগলেন। ব্যাপার দেখে তাড়াতাড়ি আমার কোলের ওপর থেকে সানগ্লাসটা তুলে নিয়ে বললাম, ওখানে ওভাবে কি খুঁজছেন ? এই তো আপনার সানগ্লাস।

ডান হাত দিয়ে সেই ভাবেই হাতড়াতে হাতড়াতে মুখ তুললেন উনি। বাঁহাতটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

সানগ্লাসটা এগিয়ে দিতে গিয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তে যতখানি চমকান যায় প্রায় ততখানিই চমকে উঠলাম আমি। লোকটা সম্পূর্ণ অন্ধ! বাঁ-চোখে বিশাল একটা গর্ত। কোনো আইবল নেই। ডানচোখটা

সম্পূর্ণ ছানিপড়া। অথচ খানিক আগে এঁকেই বই পড়তে দেখেছি আমি! এতক্ষণ যে আমার সংগে কথা বললেন! একবারও তো মনে হয়নি মানুষটা অন্ধ।

একরকম হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম ওর চোখের দিকে। ইতিমধ্যে উনি হাতড়ে হাতড়ে আমার হাত থেকে সানগ্লাসটা নিয়ে চোখে পরে ফেলে ফের মেঝের ওপর ঝুঁকে পরে দুহাতে চারপাশ হাতড়াতে শুরু করেছেন। দেখে হঠাৎ যেন আমার সম্বিৎ ফিরে এল। অস্ফুট স্বরে বললাম, আপনি কি আপনার বাঁ চোখের পাথরটা খুঁজছেন?

–হ্যাঁ–হ্যাঁ ম্যান। তুমি কি পেয়েছ ওটা? প্লিজ দাও।

আমি বললাম, পাথরটা আপনার ডান দিকে মেঝেতে পড়ে আছে। দেয়ালের ধার ঘেঁষে।

প্রায় তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোক ডানদিকে ঘুরে গেলেন। তারপর পাগলের মতো দেওয়ালের লাগোয়া মেঝেটা দুহাতে প্রায় সাপটাতে শুরু করলেন। তবুও পাথরটার ওপর ওঁর হাতটা কিছুতেই আর পড়ছিল না। অথচ চোখের সামনে পাথরটা আমি পরিষ্কার দেখতে পারছিলাম। প্রায় পায়রার ডিমের আকৃতির মসৃণ পাথরটা বেশ উজ্জ্বল। একবার মনে হলো তুলে ওঁর হাতে দিই। অথচ বস্তুটাকে ধরবার কথা ভাবতেই কেমন শিউরে উঠলাম।

যাই হোক ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলেন বস্তুটা। হাতে পেয়েই পরম মমতায় সেটা পরিষ্কার প্যান্টের কাপড়ে মুছতে শুরু করলেন। তারপর চোখের সানগ্লাসটা সামান্য তুলে পুরে দিলেন বাঁ চোখের ভেতর।

ট্রেনটা ইতিমধ্যে চিংগেলপুট স্টেশনের ভেতর ঢুকে পড়েছে। গতি কমে আসছে ক্রমশঃ। চট্ করে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। মেঝেতে ছিটকে পড়া বইটা তুলে নিলেন। সামান্য হেসে বললেন, চলি মিঃ। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। প্রত্যুত্তরে আমিও হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। ট্রেনটা ততক্ষণে থেমে পড়েছে। করমর্দন করে নেমে গেলেন উনি।

ডি-সুজা পরিবারের বর্তমান পুরুষ বেনডিক্ট ডিসুজার সংগে আর দেখা হয় নি আমার। জানিনা শেষ পর্যন্ত উনি সেই দেবমূর্তিটি খুঁজে পেয়েছেন কিনা। আর খুঁজে পেলেও সেই পাথরের চোখটা সত্যিই কি উনি যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়েছেন?

ছবি–দিলীপ দাশ

অনেক দিন পরে আবার বেরিয়েছে

ছোটদের বুক অফ নলেজ

(সম্পূর্ণ পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত সংস্করণ)

বাংলা ভাষায় বুক অফ নলেজের অদ্বিতীয় বই। এমন কোনো বিষয় নেই যা এই বইটিতে নেই। এক কথায় বলা যায় সমস্ত পৃথিবীটিকেই এই বইটি এনে দেবে মুঠোর মধ্যে। ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, দর্শন থেকে আরম্ভ করে মনীষীদের জীবনী, প্রাচীন গুহামানবের পরিচয়, হাল আমলের বিজ্ঞানের অগ্রগতি, মহাকাশ অভিযান, ভারতীয় মহাকাশযাত্রীদের কথা, খেলার কথা আরও অনেক অজানা কাহিনী। মস্ত আকারের বইটি পাতায় পাতায় ছবিতে ভরা। আর আছে অজস্র রঙিন ছবি।

দাম : ১২০ টাকা মাত্র

১২০ টাকা পাঠালে বইটি রেজিস্ট্রি করে পাঠানো হবে।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

আঠারশো তিয়াত্তর সালের ছাব্বিশে অক্টোবর। দু'জন জেলে আর টম নামে এক বালক একটি ছোট্ট জেলে নৌকোয় নিউফাউন্ডল্যান্ডের পর্তুগাল কেভে সমুদ্র উপকূলে মাছ শিকারে বেরিয়েছে।

মাছ ধরতে ধরতে ওরা তো মনের আনন্দে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ নজরে পড়ল, অদ্ভুত আকৃতির কি একটা নৌকোর পাশ ঘেঁষে ভেসে চলেছে। বার বার তাকিয়েও বুঝতে পারল না ওরা জিনিসটা কী। কত সময় কত কিছুই তো ভেসে আসে সমুদ্রের জলে–মৃত জীবজন্তুর দেহ, উল্টে-যাওয়া নৌকো, ডুবে-যাওয়া জাহাজের তক্তা, মানুষের মৃতদেহ–এমনি আরও কত কী। দেখে দেখে দূর থেকেই ওরা সেসবের পরিচয় নিতে অভ্যস্ত হয়ে

উঠেছে। কিন্তু আজকের বস্তুটির সঙ্গে পরিচিত কোনো কিছুরই মিল খুঁজে না পেয়ে ওরা অবাক হলো।

একজন দাঁড়িয়ে উঠে সপাটে দাঁড়ের খোঁচা মেরে বসল ভাসমান বস্তুটার গায়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চল বস্তুটিও নড়েচড়ে উঠল। পরের পর পড়ল আরও কয়েকটা খোঁচা।

কয়েক পলকের ফারাক। খোঁচা দেওয়ার ফলে হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যে তার জন্য ওরা কেউই তৈরি ছিল না।

হঠাৎ যেন ভাসমান বস্তুটার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হলো। আর পলকের মধ্যে সেটার চারপাশে অসংখ্য সাপ যেন কিলবিল করে উঠল। আলোড়িত হলো সমুদ্রের জল। তার পরেই প্রচণ্ড বেগে ছুটে এসে নৌকোটাকে আক্রমণ করে বসল সেটি। জেলেদের আর বুঝতে তখন বাকি নেই যে অজান্তে খোঁচা মেরে তারা ভয়াবহ কোনো সামুদ্রিক প্রাণীর মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে। সময় নষ্ট না করে তারা দাঁড় টেনে নৌকো নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে প্রাণীটি দুটি বিশাল লতার মতো শুঁড় দিয়ে ডিঙিটাকে জড়িয়ে ধরেছে। ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ তিনটির চোখের ওপরই পলকের মধ্যে পরপর আরও আটটি শুঁড় নৌকোটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে সবেগে জলের তলায় টেনে নিয়ে চলল।

সেই মুহূর্তে টমের মনে পড়ল, পাটাতনের নিচে একটা কুড়ুল রাখা আছে। যেমনি মনে পড়া, অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটি বার করে নিয়ে উন্মত্তের মতো হাত চালিয়ে বিদ্যুতের গতিতে শুঁড়গুলোকে ছেঁটে ফেলল নৌকোর গা থেকে। রক্তে লাল হয়ে গেল দরিয়ার নীল জল। সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেল টমেরা।

টম আর তার সঙ্গীরা সেদিন বুঝতেও পারেনি অমন নিরীহ নিশ্চল ভঙ্গিতে ওদের নৌকোর পাশে ভেসে আছে যে জীবটি, সে আর কেউ নয়–সাগরের আতঙ্ক স্কুইড। স্কুইডের সামান্যতম পরিচয় জানা থাকলেও

তারা সেদিন ঊর্ধ্বশ্বাসে নৌকো নিয়ে পালাত।

স্কুইড হলো সমুদ্রের এক সাংঘাতিক প্রাণী যার জ্ঞাতিভাই অষ্টভুজ অক্টোপাশ। আকৃতি এবং প্রকৃতিতে দুজনের মধ্যেই মিল আছে। সামান্য অমিলটুকুই তাদের নামকরণের ভিন্নতা এনেছে এবং আলাদা করে চিনে নেবারও সুযোগ করে দিয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে স্কুইডের বাহু দশটি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাহু এদের আটটি; অবশিষ্ট দুটি শুঁড়। বাহুর তুলনায় শুঁড় প্রায় চার-পাঁচ গুণ লম্বা; যার ফলে এরা সবার আগে শুঁড় বাড়িয়ে দিয়ে শিকার অথবা শত্রুকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। পরে অবশিষ্ট আটটি বাহুকে কাজে লাগায়। টমদের নৌকোটাকে স্কুইড প্রথমে শুঁড় দিয়েই জড়িয়ে ধরেছিল। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও স্কুইডের বাহু কিন্তু বেরিয়েছে আসলে ওর ছোট্ট মাথাটি থেকে। আর প্রধানতঃ এ কারণেই স্কুইডের আর এক নাম শিরোপদ প্রাণী।

এক জোড়া পাখনাও আছে এদের দেহের পেছন দিকে। এই পাখনার সাহায্যে তারা জলে ভেসে থাকতে বা সাঁতার কেটে বেড়াতে পারে। অবলীলায় বিরাট দেহটা নিয়ে স্কুইড ঘণ্টায় বিশ মাইল বেগে সাঁতার কাটতে পারে। ইচ্ছেমতো ডাইনে বা বাঁয়ে, সামনে কি পেছনে ঘোরাফেরার ব্যাপারেও এই পাখনা দুটি তাকে সাহায্য করে। স্কুইড যখন ভেসে থাকে, তখন ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারে না তার আসল পরিচয়। মনে হয়, নিশ্চল কোনো বস্তু বুঝি জলে ভেসে আছে।

প্রাণে বেঁচে গিয়ে আতঙ্কিত জেলেরা সেদিন যখন তীরে গিয়ে নৌকো ভেড়ালো, তখনো তাদের নৌকোর খোলের ভেতরে জানোয়ারটার খণ্ডিত রক্তাক্ত শুঁড় দুটি পড়েছিল। মেপে দেখা গেল, সে দুটি লম্বায় প্রায় বারো ফুট। এই শুঁড় এবং হাত বা পাগুলোই স্কুইডের প্রধান হাতিয়ার—কি উদরপূর্তির ব্যাপারে, কি আত্মরক্ষার কাজে।

স্কুইডের বাহুগুলোতে এবং শুঁড়ে কয়েকটি শোষক যন্ত্র থাকে। যত শক্তি এদের এই শোষক যন্ত্রেই। এগুলো অনেকটা সাঁড়াশির মতো কাজ করে। কোনো কোনো শোষক যন্ত্রে মসৃণ বলয় থাকে; কতগুলোর বলয় আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁত বা কাঁটা দিয়ে ঢাকা। স্কুইড যখন শিকারকে জাপটে ধরে, তখন এই শোষক যন্ত্র খাঁজে খাঁজে আটকে গিয়ে এমন কঠিন বাঁধনে বাঁধে যে তার থেকে মুক্তি পাওয়া এক রকম অসম্ভব।

সব স্কুইডের শোষক যন্ত্র আবার সমান হয় না। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত প্রায় তিনশটি বিভিন্ন জাতের স্কুইড আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রায় প্রত্যেক জাতের শোষক যন্ত্রই আলাদা আলাদা ধরনের।

স্কুইডের আকার যেমন বিশাল, তেমনি এই বিশাল দেহের গঠনের বৈচিত্র্যও কম নয়। সাধারণত লম্বায় এরা বারো ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। দৈহিক ওজনে প্রায় তিন হাজার পাউন্ড। আজ পর্যন্ত যত স্কুইড ধরা পড়েছে,

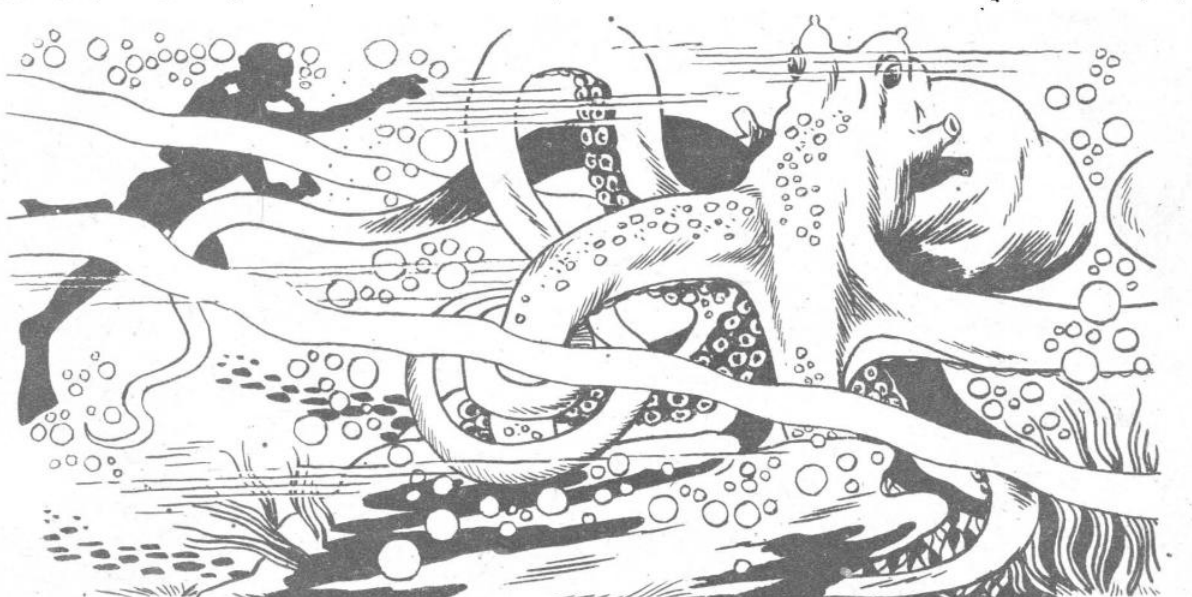

শিকার দেখলেই এরা এঁকে বেঁকে ধীর গতিতে শিকারের দিকে এগোয়।

তাদের সর্বোচ্চ হিসাব এই। এদের মাথা সোজাসুজি দেহের সংগে যুক্ত। চোখ দুটো গোলাকার এবং মনে হয় যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মতো বস্তু হলো, এদের ইস্পাতের মতো শক্তিশালী অদ্ভুত আকৃতির একজোড়া ঠোঁট। এই ঠোঁট জোড়া স্কুইডের অন্যতম হাতিয়ার বিশেষ। বাহুর পেষণে হত্যা করার পর স্কুইড এই ঠোঁট জোড়ার সাহায্যে শিকারের দেহ টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলে। স্কুইড শিকারের সময় দেখা গেছে, এই ঠোঁটের চাপে বর্শার ফলা, এমন কি কঠিন ইস্পাতের তার দিয়ে তৈরি জালও টুকরো করে ফেলেছে। সব জাতের স্কুইডের পক্ষেই অবশ্য এই ভয়ংকর অবিশ্বাস্য কাজ সম্ভব হয় না। বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীর স্কুইডের ঠোঁটই ইস্পাতের মতো কঠিন। তবে স্কুইডের গোষ্ঠীর প্রায় সবারই ঠোঁট কমবেশি মজবুত।

সাধারণতঃ সমুদ্রের গভীর অংশে থাকলেও অগভীর উপকূল ভাগেও স্কুইডকে কখনো কখনো দেখা যায়। অনেক সময় শিকারের পিছু ধাওয়া করে এরা মাঝসমুদ্র থেকে তীরের কাছাকাছি চলে আসে। এই দৈত্যাকৃতি প্রাণীটির শিকার ধরার কৌশলটি বড়ই উপভোগ্য। শিকারে দেখলেই এরা এঁকে বেঁকে ধীরগতিতে শিকারের দিকে এগোয়। কাছাকাছি চলে আসার পরে আচমকা কিছুটা পিছু হটে আসে। দেখলে মনে হবে, বুঝি বা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আসলে এটা আক্রমণেরই একটা কৌশল। পিছু হটে এসে স্কুইড আর সময় নষ্ট করে না। বিদ্যুৎগতিতে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে দিয়ে টেনে আনার মতো করে এরা প্রথমে শিকারকে দীর্ঘ শুঁড়ের জালে জড়িয়ে ধরে। তারপর ধীরে ধীরে টেনে এনে আট বাহু বাড়িয়ে চাপ দিয়ে আটকিয়ে দেয় শিকারকে। দশভুজার কবলে মহিষাসুরের নিধন হবার মতো স্কুইডের 'দশভুজ' একবার যাকে জড়িয়ে ধরে তার মৃত্যু ছাড়া আর কোনো গতি থাকে না।

শিকার অনুসন্ধানেও এরা আশ্চর্য এক কৌশল প্রয়োগ করে। নিশ্চল ভাবে মড়ার মতো জলের ওপর ভেসে থাকতে দেখলে সুচতুর প্রাণী প্রাণভয়ে এর ধারে কাছে ঘেঁষে না—মৃত ভেবে ভুল যারা করে তাদের আর নিস্তার থাকে না।

নানা জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী ও বড় বড় মাছ এদের প্রধান খাদ্য। তবে গভীর জলের টুনি মাছ হাতের কাছে পেলে অন্য খাদ্যের প্রতি আর তেমন রুচি থাকে না।

স্কুইডের প্রধান শত্রু হলো তিমি, বিশেষ করে থ্যাবড়ামুখো স্পার্ম তিমি আর জেলি ফিস। এদের ভয়ে তাকে সদাই শঙ্কিত আর সতর্ক থাকতে হয়। অবশ্য বেকায়দায় পড়ে গেলে আত্মরক্ষার উপযোগী বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করবার ব্যবস্থাও প্রকৃতি তার জন্য করে দিয়েছে। যঃ পলায়তি স জীবতি—এ নীতি অনুসরণ যেখানে ফলবতী হবে না বলে মনে হয়, সেক্ষেত্রে বহুরূপীর মতো ঘন ঘন দেহের রঙ পরিবর্তন করার উপযুক্ত ব্যবস্থা স্কুইডের দেহে রয়েছে।

অনেক সময় অধিকতর চতুর শ্রেণীর প্রাণীরা, যেমন তিমি, এদের বহুরূপীর ছদ্মবেশ ধরে ফেলে। তাতেও অবশ্য স্কুইডের ঘাবড়াবার কিছু থাকে না, তারও প্রতিবিধান সে প্রকৃতির কাছ থেকেই লাভ করেছে। তিমির শ্যেনচক্ষুতে ধরা পড়ে গেলে এরা কালির মতো একপ্রকার পদার্থ জলে ছিটোতে থাকে। ফলে চার-পাশের জল কখনো কালো কখনো বা ঘোলা হয়ে গিয়ে তাকে ঢেকে ফেলে আর সেই সুযোগে প্রাণ হাতে নিয়ে স্কুইড যাকে বলে চোঁচা দৌড়। স্কুইডের দেহে এমন এক ধরনের ব্যবস্থাও আছে, যার সাহায্যে এরা উজ্জ্বল নীলাভ আলো দেহ থেকে বিকিরণ করতে পারে। এই আলোর ব্যবস্থা থাকায় আচমকা আলোর ঝলক দিয়ে শত্রুর চোখে ধাঁধা লাগিয়ে পলায়নের কাজটি সহজে করতে পারে।

ছবি : ইন্দ্রনীল ঘোষ

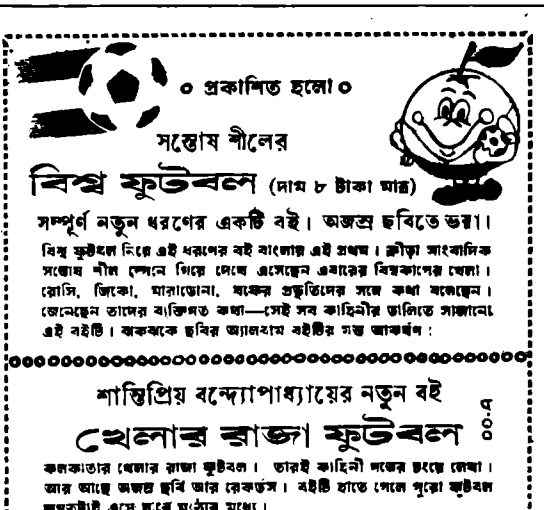

হঠাৎ পথের পাশ থেকে একটা অনুচ্চ তর্জন শোনা গেল। নরকণ্ঠে অজানা ভাষা। কিন্তু তার অর্থ বুঝতে কষ্ট হল না। সে অর্থ হল "থামো"।

থামতেই হল। অমনি পথপার্শ্বের আবছা আঁধার থেকে বেরিয়ে এল কয়েকটা অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্তি, কোনো জিজ্ঞাসাবাদের ভিতরে না গিয়ে ঘিরে ধরল আমাকে। ঘিরে ধরল আমার বুকে পিঠে পাঁজরায় তরোয়ালের ডগা আর বল্লমের ফলা ঠেকিয়ে। ভাষাহীন অনুজ্ঞাটির অর্থ অতি পরিষ্কার—কোনরকম বিদ্রোহের চেষ্টা যদি আমার তরফ থেকে হয়, মৃত্যু তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই হবে, কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। বলা বাহুল্য, বিদ্রোহের চেষ্টা হয় নি আমার তরফ থেকে।

আবার এগিয়ে চলি। আগের চাইতেও দ্রুত। আরও আরও দল চোখে পড়ে। চারটি পাঁচটি লোকের বেষ্টনী দিয়ে ঘেরা একটা মানুষ। ঐ পরিবেষ্টিত মানুষটা যে আমারই সাফারির মানুষ, তা কি আর বলে দিতে হয়?

একটা কথা আমার এখন মনে হয়। ডাইন যাদুকর ভাকলুভাম এত আড়ম্বর না করলেও পারত। তার অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাশক্তি অন্য সাহায্য ব্যতিরেকেই আমাকে এবং আমার একশো সঙ্গীকে টেনে নিয়ে তার কয়েদখানায় পুরতে পারত। আমরা তো যাচ্ছিলামই, মাঝখান থেকে তাহলে তরোয়াল বল্লমের কেন এই আস্ফালন?

ভোর ভোর সময়ে আমার চোখে পড়ল, লোকালয়ে এসে পড়েছি আমরা। মাকুং নদীর সেই শুক্‌নো খাত এখন আকার নিয়েছে একটা রাস্তার। এবড়ো খেবড়ো বেমেরামত হলেও সেটা যে রাস্তা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, বহু বহু লোকের দ্বারাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার এখন প্রমাণ পাচ্ছি পায়ে পায়ে।

রাস্তার দুই ধারে দূরে দূরে ছোট ছোট বাড়ি। সব বাড়িই পাথরের। তবে তার উপরটা খড় দিয়ে ছাওয়া। কাঠেরই দরোজা সব, কিন্তু জানালা কোনো বাড়িতেই নেই। সব বাড়িরই সম্মুখে খানিকটা করে বাগান।

তখন পর্যন্ত বাড়িগুলো সবই নিস্তব্ধ। স্বাভাবিক, রাত এখনও কাটে নি।

গ্রাম? না, শহর? বোঝা গেল না শেষ রাত্রির সেই পাতলা অন্ধকারে। অন্ধকার পাতলা হলেও নিশ্ছিদ্র। কোথাও আলোর ফুলকিও চোখে পড়ে না একটা।

হঠাৎ কিন্তু একটা অনুজ্জ্বল আলোর প্লাবনে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠল সমুখের একটা বাড়ি। এ-বাড়িটা দ্বিতল এবং অতি বৃহৎ।

আলো! স্বাগত। কিন্তু হতবুদ্ধিকর। আলোই যদি তবে তার রং এমন কেন? ফিকে সবুজ? আমাদের চির পরিচিত সূর্য শশীর রং তো এমন হয়ই না। আকাশের লক্ষ কোটি জ্যোতিষ্কের মধ্যে কোনটিকেই এ-যাবৎ দেখিনি এমন আজগুবি আলো বিকীরণ করতে।

ঐ আলো নিয়েই বিস্ময়ের কারণ আরও ছিল। সেটা তখন ঠাহর করি নি, খেয়ালের মধ্যে এসেছিল পরে কোন এক সময়ে, বিশ্রামের মুহূর্তে অতীত ঘটনার পর্যালোচনা আর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে।

সে বিস্ময়টা এই। ফিকে সবুজ সেই আলোটার উদ্ভাসকে আমি সীমাবদ্ধ দেখেছিলাম সেই একটি মাত্র বৃহৎ বাড়িতে। আমার বেশ মনে পড়ে সে আলোর ছিটে-ফোঁটাও লক্ষ্য করি নি আশপাশের কোন বাড়িতে বা বাগানে। এমনটা কেমন করে হয়, তা বন্দীজীবনের প্রথম প্রহরগুলিতে মোটেই বুঝতে পারি নি। আলোটা কি বৈদ্যুতিক? সে-সম্ভাবনার কথা ভাবতে গিয়েই হেসে উঠেছিলাম আপন মনে। বিদ্যুৎ? কিলিমাঞ্জারোর এই অন্ধকূপে রঙিন বিদ্যুৎ?

না, বিদ্যুতের কোনো ব্যাপারই নয়। আলোটার উৎস হল একটা অতিকায় পদ্মরাগ মণি। কোথায় সেটা পেয়েছিল ডাইন ভাকলুভাম, তা সেই জানে। কিন্তু ঐ গোটা জনপদটার আবালবৃদ্ধবনিতা যুগ যুগ ধরে মণিটাকে দেখে আসছে ভাকলুভামের অধিকারে। সে যখন দরবারে বসে। তার সমুখেই মণিটাও থাকে একটা পাতলা কাপড়ের আবরণে ঢাকা। সেই কাপড়ের তলা থেকে বিকীর্ণ হয় ঐ সবুজ আলোকছটা। দেশের লোক নাকি বিশ্বাস করে যে মণিটা দৈবশক্তিসম্পন্ন। ভাকলুভামের যাদুর শক্তি অবশ্য অপরিমেয়। কিন্তু ঐ মণিটা হাতের নাগালে না পেলে সে শক্তি কোনমতেই স্ফূর্তি পায় না। পক্ষান্তরে, ভাকলুভাম ছাড়া অন্য কোনো লোকও যদি ঐ সবুজ মণিকে সাময়িকভাবে হাতে পায়, যাদুবিদ্যার পরিচয় সে দিতে পারুক বা না পারুক, দুর্বার ইচ্ছাশক্তির পরিচয় সেও দিতে পারে। মণির উপরে হাত রেখে যে-কোন বর্বর যা কিছু অভিলাষ করুক, দুনিয়ার মানুষ কারও সাধ্য নেই যে তার সে অভিলাষের বিরোধিতা করে।

কিন্তু আমার কাহিনীর খেই হারিয়ে ফেলেছি।

যারা আমাকে বন্দী করে এনেছে, তাদের কারও চেহারাই এ-যাবৎ দেখবার সুযোগ পাই নি আমি। একটা কথাই শুধু মনে হচ্ছিল সারাক্ষণ, লোকগুলি সবাই লম্বা-চওড়া শক্তিমান। এইবারই চাক্ষুষ দেখে উপলব্ধি হল যে সে ধারণা ভুল নয় আমার। তা ছাড়াও উপলব্ধি করলাম অন্য একটা ব্যাপার। এই তরোয়াল বল্লমধারী সৈনিকদের মধ্যে অন্ততঃ অর্ধেক লোকই হচ্ছে নারীজাতীয়। পরে জেনেছিলাম যে ও-দেশে পুরুষের চাইতে নারীর সংখ্যাই বেশী, এবং প্রশাসনের ব্যাপারে নারীদেরই প্রাধান্য দিয়ে থাকে ভাকলুভাম। তার নিজের প্রাসাদ (ঐ আলোকিত বড় বাড়িটাই হল তার বাসগৃহ এবং শাসনকেন্দ্র) পাহারা দেবার ভার সে পুরুষদের দেয় না কখনও, আবহমান কাল নারীসেনাই বহন করে আসছে সে-দায়িত্ব। পুরুষদের চাইতে নাকি বেশী যোগ্যতার সঙ্গেই করছে বহন।

যা হোক, শেষ রাত্রে আমরা পৌঁছে গিয়েছি ডাইন যাদুকরের দরবারে। এখন আর দর্শন পাওয়া যাবে না তাঁর। অপেক্ষা করতে হবে পরদিন দুপুর পর্যন্ত। নারী সৈনিকেরাই আমাকে নিয়ে গেল প্রাসাদের ভিতরে, ঠেলে ঢুকিয়ে দিল একটা প্রকাণ্ড ঘরে, যাতে গিজগিজ করছে নারী সৈনিক। লক্ষ্য করলাম, আমার সাফারির অনেক লোক আমার আগেই এসে ঢুকে পড়েছে এই সেনাবারিকে। তার মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ল আলবুর্জ আর রীকিকে। ন্যাথানিয়েলকে ওরা নিয়ে এল একটু বেশী বেলায়। সৈনিকদের চোখে ধূলি দিয়ে ও নাকি পাহাড়ে জঙ্গলে লুকোচুরি খেলতে পেরেছিল কিছুক্ষণ।

এক ঘরেতেই আছি বটে অনেকে আমরা, কিন্তু নারীসেনার কড়া শাসনে পরস্পরে কথাবার্তা চালাচালির কোনো উপায় নেই। পুরুষ সৈনিকেরা আমাদের এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে সেই যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, আর তাদের দেখতে পাচ্ছি না।

বেলা আড়াই প্রহর পর্যন্ত কষ্টকর প্রতীক্ষা। খাদ্য পানীয়ের দর্শন নেই, একটা বসবার আসন পর্যন্ত পাই নি। চেষ্টা করছি, নারীদের আলাপচারি শুনে শুনে এ-দেশের সম্পর্কে যথাসম্ভব জ্ঞানার্জন করতে। সে-ব্যাপারে প্রধান অন্তরায় ভাষা, তবে ওরই মধ্যে একটু সুবিধা হয়ে গেল। আলবুর্জ আর রীকি জন্মাবধি আফ্রিকায় আছে, ঠিক এখনাকার এই ভাষাটার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলেও এমন দুই একটা উপজাতীয় কথ্য ভাষা ওরা জানে, যা এখানকার ভাষার অনেকটা সগোত্র। তাই, পুরোপুরি না হোক, অন্ততঃ আধা-আধি নারীদের কথা ওদের হচ্ছিল বোধগম্য।

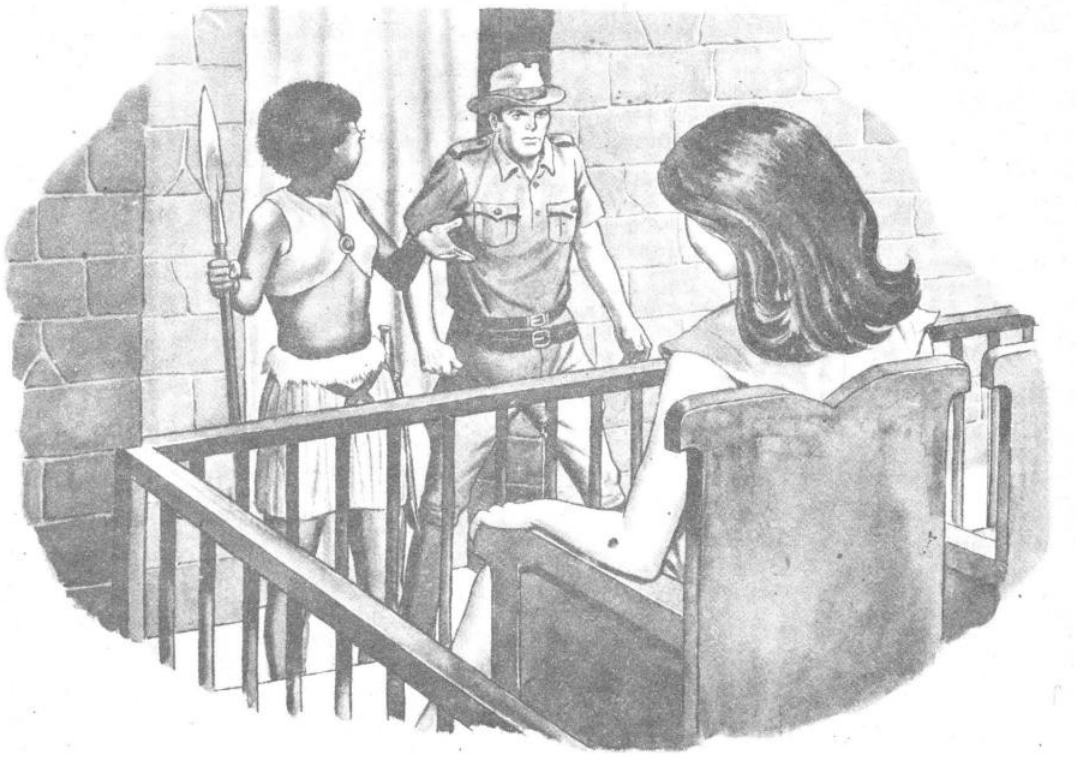

ইনি ভাল্লার রাণী। ভালকু ডাইনের মেয়ে

সেই সূত্রেই জানা গেল, দেশটার নাম ভাল্লা, ভাকলুভামই এ দেশের সর্বেশ্বর। কত যুগ ধরে সে রয়েছে সর্বেশ্বর, তা কেউই জানে না। বহির্জগতের সব কিছু ব্যাপারে ত বটেই, নিজেদের দেশের ঘরোয়া সব ব্যাপারেও ওরা আশ্চর্য রকমে অজ্ঞ।

দেশটার নাম ভাল্লা। শাসকের নাম ভাকলুভাম। সেই ভাকলুভাম অপরিমেয় যাদুশক্তির অধিকারী। তার উপরে তার অধিকারে আছে সবুজমণি। সে মণির দাম পাঁচ সাত মিলিয়ন পাউন্ডও অনায়াসে হতে পারে। যদি তা কোনো রকমে এদেশ থেকে বার করে ইউরোপ বা আমেরিকার বাজারে চালান দেওয়া সম্ভব হয়।

মণিটি শুধু যে মূল্যবান, তাই নয়। শক্তিমানও। ভাকলুভামের যা যাদুশক্তি, তার কতখানি তার নিজস্ব, আর কতখানি এই সবুজমণির কাছ থেকে পাওয়া, তা সঠিক বলতে পারে না কেউ। ভাকলুভাম যখনই দরবারে বসে, হাতখানি রাখে ঐ মণির উপরে। তা যদি না রাখে, ওর আদেশ কম লোকেই মানবে বলে তার প্রজাদের ধারণা।

যা হোক, ইত্যাকার জ্ঞান আহরণ করতে করতেই বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। ক্ষুধাতৃষ্ণায় আমরা যখন ছটফট করছি, তখন নারীসেনার সর্দারণী এসে জানালো, দরবারে আসন গ্রহণ করেছে সর্বেশ্বর ভাকলুভাম, বন্দীদের তিনি দেখতে চান।

কে যাবে আগে? কে এই বিদেশীদের নেতা?

প্রশ্ন হতেই আমি এগিয়ে গেলাম সর্দারণীর দিকে। সে আমাকে নিয়ে অগ্রসর হল একটা দরোজার দিকে। দরোজা খোলাই আছে। কিন্তু একটা পুরু পর্দা ঝুলছে তাতে। এরকম দামী পর্দা এই হতচ্ছাড়া ভাল্লায় দেখতে পাব, তা ভাবি নি। পরে জেনেছিলাম, লর্ড হেলমেটকে ওরা বন্দী করে যখন, এই পর্দা এবং আরও আরও সব শৌখিন জিনিস তাঁর ভাণ্ডার থেকেই লুটে এনেছিল ভাকলুভামের লোকেরা।

পর্দা ঠেলে প্রতিহারিণী এইবার দরবার ঘরে ঢুকলো। তার সঙ্গে ঢুকলাম আমিও। ঢুকেই তাকাচ্ছি সমুখপানে। রেলিং-ঘেরা খানিকটা স্থান কক্ষের কেন্দ্রে। তাতে পাশাপাশি – দুখানা – আসন।—অনেকটা – সিংহাসনের

আকারের। তার একখানা তখনও খালি। অন্যখানায় বসে আছে, বিশীর্ণ বুড়ো ভাকলুভাম নয়, এক অনিন্দ্যসুন্দরী ষোড়শী।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছি তাকে, সর্দারণী বলল–"ইনি ভাল্লার রাণী। ভাকলু ডাইনের মেয়ে।"

আমি ফোঁস করে উঠলাম। স্থানকাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে। রাণী হয়ত হতে পারে এ মেয়ে। কিন্তু বর্বর ডাইন ভাকলুভামের মেয়ে? অসম্ভব। হতেই পারে না। পহেলা নম্বরের ধাপ্পাবাজি এটা। এ-মেয়ের ধমনীতে যে অভিজাত শ্বেতাঙ্গের শোণিত বইছে, তা আমি যে-কোন আদালতে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি।

প্রথম দর্শনেই আমার মনে প্রবল সন্দেহ। এ-মেয়ে তো লর্ড হেলমটের মেয়ে নয়?

এতক্ষণ মুখ বুজে গল্প শুনে যাচ্ছিল টারজান, এইবার সে মৌন ভঙ্গ করতে বাধ্য হল। "কেন? কেন? এমন সন্দেহ তোমার কেন হল হেক্টর?"

প্রশ্নটার জন্য বোধহয় প্রস্তুতই ছিল সে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে জবাব দিল–"ওর চেহারার ধাঁচ আলাদা বলে। ভাল্লায় সুশ্রী মেয়ে নেই, তা আমি বলি না। রংও অনেকেরই ফর্সা। বহু পুরুষ ধরে বহিরাগত সাদা মানুষদের যাতায়াত হয়েছে ভাল্লায়। অনেকেই বিয়ে করে স্থায়ী বাসিন্দা বনে গিয়েছে ওখানে। যার ফলে আমরা বর্তমানে ওদেশে দেখতে পাচ্ছি এমন একটা জাতিকে যাদের সংকর-জাতি ছাড়া অন্য কিছুই বলা যায় না। সেই সংকরদের মধ্যেও সৌন্দর্য নেই কারও, এমন কথা আমি বলব না। কিন্তু তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভালকু-ডাইনের কন্যাপরিচয়ে যে-বালিকা জন্ম থেকে রানীগিরি করছে ভাল্লাতে, তার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের এক সৌন্দর্য, যার অনুরূপ আমি ভাল্লায় অন্য কোনো রমণীর ভিতর দেখিনি। আমার বিশ্বাস, খাঁটি ইউরোপীয় দেহশ্রী বলতে যা বোঝায়, ঐ তথাকথিত মেয়েটির মধ্যে সেই জিনিসই আছে। তা খাঁটি ইউরোপীয় লর্ড হেলমট ছাড়া অন্য কেউ গত বিশ পঁচিশ বছরের ভিতর আসে নি ভাল্লাতে, এটা সকলের মুখেই শুনেছি। তার সঙ্গে আমি মিলিয়ে নিয়েছি অন্য একটা তথ্য। সেটা এই যে লর্ড হেলমট এসেছিলেন সস্ত্রীক, এবং ভাল্লায় অবস্থান-কালেই মারা যান তাঁর সেই স্ত্রী। মারা যান হেলমট নিজেও কিছু দিন পরে।"

"মেয়েটি?" সংক্ষেপ প্রশ্ন টারজানের।

"মেয়েটির আর কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। ওর জননী যে হেলমটের ইংরেজ আত্মীয়ই,এমন কোন প্রমাণও কোথাও নেই। আরও এক কথা, হেলমটের মৃত্যুর পরে তাঁর মেয়ে মরল না বাঁচল, জানে না কেউ। ও বিষয় নিয়ে আলোচনাও কেউ করতে চায় না। দুই বৎসরের বন্দীজীবনে আমি তার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু জানতে পারি নি কিছুই। পক্ষান্তরে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল ঐ মেয়েটির তিরোধানের সম-সময়েই! একটি শিশুকন্যাকে একদিন দরবার ঘরে সর্বসমক্ষে হাজির করে দিলেন ডাইন ভালকুভাম। পরিচয় দিলেন–তাঁরই কন্যা বলে। লোকে বিশ্বাস করল না, কথাটা অবিশ্বাস্য বলে। লোকে প্রশ্নও তুললো না। ডাইনের কথার সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করা দুঃসাহসের কাজ হয় বলে।"

"কথাটাকে অবিশ্বাস্য বলছ কেন?"

"একশো বছরের বুড়ো বুড়ী ভাল্লাতে অনেক আছে। তারা একশো বছর ধরেই ভালকু ডাইনকে ভাল্লার দরবার ঘরে একই অবস্থায় দেখে আসছে। একধারে রাজা ও ধর্মগুরু, সবজান্তা ও সর্বশক্তিমান। তার যে সংসারে আপনজন কেউ কোথাও আছে, সেই একশো বছরের ভিতরে কোনোদিন কেউ এমন কথা ভাববার কারণ দেখতে পায় নি। হঠাৎ, বছর পনেরো ষোল আগে ভালকু যখন ঘোষণা করল যে ঐ ইউরোপীয় রূপশ্রীমতী-মেয়েটি তারই কন্যা, লোকে তা কেমন করে নির্বিচারে বিশ্বাস করে?"

কথা কইছে হেক্টর, কিন্তু এইখানে হঠাৎ ঘটনা ঘটে গেল একটা। কথা থামিয়ে সে যেন উৎকর্ণ হয়ে শুনবার চেষ্টা করল দূরাগত কোনো অস্পষ্ট আহ্বান। তারপরই বিবর্ণ হয়ে গেল তার মুখ। থরথর করে কাঁপতে লাগল তার সারা দেহ। টারজানের দিকে যে-দুটি চক্ষুর দৃষ্টি সে নিবদ্ধ করে রইল, তা যেন অবিকল মরা মানুষের চোখের মতো নিষ্প্রভ।

"তোমার হলো কী হে?" আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল টারজান–"বড়ই যেন ভয় পেয়েছ?"

ধরা গলায় থেমে থেমে জবাব দিল পল হেক্টর–"তা পেয়েছি ক্লেটন! আমার অবস্থায় পড়লে যে কেউ পেতো ভয়। আমায় ডাকছে ভালকু ডাইন। ভাল্লায় বসেই ডাকছে।"

"ডা-কছে? ভাল্লায় বসে? তিন দিনের পথের ও মাথা থেকে? তুমি–মানে এই কালকালা মাঠের আগুনরোদে মাথার গোলমাল হয়েছে তোমার। পাতালতা দিয়ে একটা ছাপড়া তৈরী করে দিই তোমায়, তারই ভিতর ঢুকে তুমি একটা লম্বা ঘুম দাও। ভয় নেই, যত কাজই আমার

যেদিন আম্মার খোকন দাঁতের গর্ত আবিষ্কার করলো !

ফরহ্যান্স ফ্লোরাইড

স্বাদ আর ফেনা ওয়ালা এমন টুথপেস্ট যা দাঁত আর মাড়ি দুইই রক্ষা করে।

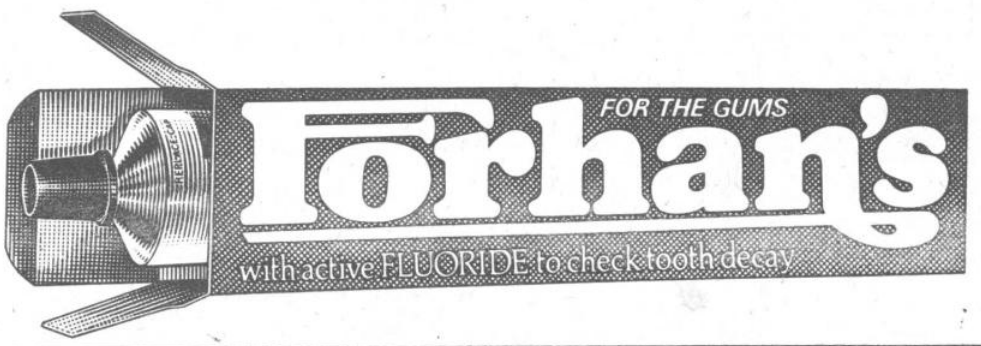

331F244 BEN

থাকুক, আজকের দিনটা তোমার কাছেই আমি থেকে যাচ্ছি। একে ন্যুমা-শীটার ভয় এখানে। তার উপরে আবার ডাইনেরা ডাকতে শুরু করে যদি তোমায়–"

"তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছ না। সেজন্য দোষ দিতে পারি না তোমায়। কিন্তু যা আমি বলেছি, তা খাঁটি সত্য। তুমি যদি ভাল্লার লোক হতে, তার ভিতর অবিশ্বাস করার মতো কিছুমাত্র দেখতে পেতে না। যুদ্ধবন্দীরা পালিয়ে গেল ভাল্লা থেকে, এ কিছু বিরল ঘটনা নয়। মাঝে মাঝেই পালাচ্ছে এমন। কিন্তু পালাবার পরে বেশীদূর কেউ যেতে পারে না। ভাল্লায় বসে, তার সবুজমণি স্পর্শ করে ভালুকভাম তার নাম ধরে ডাকতে থাকে তারস্বরে। আর পলাতক বন্দী সুড়সড় করে ভাল্লার পথে পা বাড়ায় আবার। যাওয়ার পরে অপরিসীম নির্যাতনের মুখে তাকে পড়তে হবে, একথা স্থির জেনেও।"

টারজান তর্কের ভিতর গেল না। কারণ তার দৃঢ় ধারণা, যা কিছু বলছে হেক্টর, মাথাটা খারাপ হয়েছে বলেই বলছে তা। পাগলের সংগে কেউ তর্ক করে নাকি?

তর্কের ভিতর গেল না। শুধু প্রশ্ন করল গোটাকতক।

"তুমি পালিয়েছ ভাল্লা থেকে–কবে?"

"আজ চা'র দিন।"

"এর মধ্যে আজই কি প্রথম শুনলে ডাইনের ডাক?"

"না, তা কেন? দ্বিতীয় দিন। অর্থাৎ গত পরশু থেকেই শুনছি। কিন্তু আগের সে-ডাকাডাকিতে তেমন জোর ছিল না। জোর টের পাচ্ছি আজই প্রথম।"

"এই পার্থক্যের কারণ অনুমান করেছ কিছু?"

"অনুমান কেন, কারণটা স্পষ্টই বুঝতে পারছি। ভালকু-ডাইন তার সবুজ মণি হাতে নিয়ে যখন ডাকে কাউকে, তখন সে-ডাকের আকর্ষণ হয় দুর্নিবার। আর মণি হাতে না নিয়ে ডাকলে–"

"সাড়া না দিয়েও পারে মানুষ?"

"না দিলে রেগে যায় ডাইন ঠিকই, কিন্তু অত দূরে বসে বাধ্য করতে পারে না কাউকে। পরশু থেকে আমার সংগে চলছে সেই রকম ডাকাডাকি। আমি গ্রাহ্য করিনি, সেও করতে পারেনি কিছু। কিন্তু আজকের এ-ডাক আলাদা রকমের। এ যেন আমার গলায় শিকল বেঁধে টানছে। টেনে নিয়ে যাবেই। আবার ভাল্লায়। আবার দাসত্বে। নানা অনাচারে ভরা ঘৃণ্য পরিবেশে। অথচ আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম, একবার ভাল্লা থেকে বেরুতে পারলে আমি ছয় মাসের মধ্যে এক পল্টন গোরা সৈন্য নিয়ে ফিরে আসব, ওকে মুক্ত করে আনব পিশাচ ডাইনের কবল থেকে।"

"ওকে। মানে, যাকে তুমি হেলমটের মেয়ে বলে বিশ্বাস কর? নাম কী তার? তার সংগে ঘনিষ্ঠতা করবার সুযোগ তুমি পেলে কোথায়?"

"এম্‌রেল্ডা –ঘনিষ্ঠতা? মোটেই না। সে হল রাণী, আমি হলাম বন্দী। তবে একদিন দৈবাৎ তার সামনে পড়ে গিয়েছিলাম নিরিবিলিতে। অগ্রপশ্চাৎ না চিন্তা করে হড়হড় করে ব'লে ফেলেছিলাম একটা কথা– আপনি যদি এদেশ থেকে পালাতে ইচ্ছে করেন, আমাকে আগে পালাবার সুযোগ করে দিন। কথা দিচ্ছি। আমি গোরা পল্টন নিয়ে ফিরে আসব ছয় মাসের মধ্যে। আপনাকে মুক্ত করে ইউরোপে চলে যাবার ব্যবস্থা ক'রে দেব।"

"সে কী বলল?"–জানতে চাইলে টারজান।

"বলল–তুমি এসব কথা আমাকে বলছ কোন সাহসে? জানো না। আমি ভালকুভাম ডাইনের কন্যা? তাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব? যাব কিসের দুঃখে? তোমাকেই বা আমি বিশ্বাস করব কেমন করে?"

"তারপর? তারপর?"–টারজানের কৌতূহল তুংগে উঠেছে এবার।

"তখনকার মতো সে চলে গেল ঠিকই। আমি তো এদিকে ভয়ে কাঁপছি। ঝোঁকের মাথায় একটা হঠকারিতা করে ফেলেছি। এর ফলে এখন জীবন যেতে পারে আমার। অনায়াসেই পারে। রাণীর কাছে প্রস্তাব করা যে রাণী দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাক? কী সর্বনাশ? এর চেয়ে অনেক লঘুপাপে প্রাণ-দন্ড হয়ে গিয়েছে অনেকের, আমরা তো তা স্বচক্ষেই দেখেছি! ডাইনের প্রাসাদের সিংহদ্বারে, ডাইনের দরবারের দেয়ালে দেয়ালে যে-সব চুপসে-যাওয়া কুঁকড়ে-যাওয়া নরমুন্ড লাইন করে সাজানো রয়েছে–সর্বসাধারণকে ডাইনের সর্বশক্তিমত্তার কথা অহরহ স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। তাদের বেশীর ভাগই তো পুনরাগত বন্দীদের। এসেছে, আর বিনা বাক্যব্যয়ে জহলাদ তার খাঁড়ার এক ঘায়ে মুন্ডুগুলো ছ্যাড়াডাং করে দিয়েছে তাদের! জানি তো সব! দেখেছি তা নিজের চোখে! তবু আমি কোন সাহসে রাণীর কাছে প্রস্তাব করতে গেলাম–"

[চলবে]

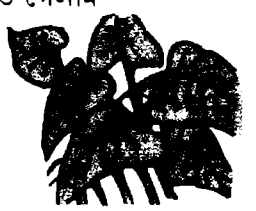

ছবি : নারায়ণ দেবনাথ

মোহনবাগানের সত্যজিত পারলেন না মহামেডানের চিমাকে রুখতে।

খেলার মাঠে মাঠে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বোয় গিয়ে এশিয় ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের বিভাগীয় লীগের খেলায় কলকাতার ইস্টবেংগল চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসেছে। তারপরই কপিলদেবের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল এক মাসের জন্যে শ্রীলংকা সফরে গিয়েছিলো।

কলম্বোয় ইস্টবেংগল গিয়েছিলো ভারতের চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে। খেলেছেও ভালো। একে একে হারিয়েছিলো নেপাল, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, পাকিস্তান আর শ্রীলংকার চ্যাম্পিয়ন দলকে। এর পর ইস্টবেংগল খেলবে এশিয় ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের মূল পর্বের খেলায়। এই লেখা ছাপা হতে হতে সেই প্রতিযোগিতাও আরম্ভ হয়ে যাবে। তাই ও কথা এখন থাক।

কলকাতার ঘরোয়া ফুটবল লীগে ইস্টবেংগল এবছর দারুণ না খেললেও মোহনবাগান আর মহামেডান হেরে, না খেলে ইস্টবেংগলের লীগ জয়ের পথ প্রায় পাকা করে দিয়েছিলো।

তাই ফিরতি লীগের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এবার খেলা তেমন জমলো না। শুধু তাই নয় মোহনবাগান না খেলে ওয়াক ওভার দিয়েছে ইস্টবেংগল আর ইস্টার্ন রেলকে। কলকাতার মাঠে অনেকদিন এ সব হয় নি। বছর বারো আগে একবার এমন কান্ড ঘটেছিলো।

এই সব কারণে বিল্টু-মন্টুদের সেজদাদু রেগে আগুন। ফুটবলের কথা বললেই রেগে যাচ্ছেন। তবে ক্রিকেট নিয়ে অনেক গল্প টল্প করেন। কিন্তু সেদিন এক কান্ড হয়ে গেলো। শংকরকাকু এসেই বললেন, সুনীল আর কপিল আবার ঝগড়া করছে শুনেছেন?

ব্যাস যাবে কোথায়! সেজদাদু ফায়ার। বললেন, ক্রিকেটে ভারত একটু ভালো খেলছে। একদিনের ম্যাচে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তা সহ্য হবে কেন? ঝগড়া করেই তো গেলো। হকি গেছে, ফুটবল গেছে, ছিলো শুধু ক্রিকেটটা—এবার তাও যাবে।

কলম্বোয় খেলতে গিয়ে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ভারত কোন রকমে দুই উইকেটে জিতেছিলো। তারপর ড্র হলো ভারত-শ্রীলংকার প্রথম

সরকারী টেস্ট ম্যাচটা। শ্রীলংকা টেস্ট ক্রিকেটের কনিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী। সবে টেস্ট খেলতে আরম্ভ করেছে তারা। কিন্তু দলগত শক্তির দিক দিয়ে তারা কিন্তু রীতিমত শক্তিশালী। দলনেতা দিলীপ মেনডিস, ওপেনিং ব্যাটসম্যান সিদাত ওয়েত্তিমুনি, রঞ্জন মাদুগালে, অর্জুন রণতুঙ্গে, উইকেট রক্ষক অমল সিলভা, মিডিয়াম পেস বোলার অশান্ত ডিমেল সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। যে কোনো দেশের সামনের সারির খেলোয়াড়দের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন এঁরা। দিয়েছেন ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গেও।

দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬ রান করেছেন।

সারা বিশ্ব জুড়ে এখন তো তরুণ খেলোয়াড়দেরই জয়জয়কার। সতেরো বছরের বরিস বেকার উইম্বলডন টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। বেকার উইম্লডনের কনিষ্ঠ চ্যাম্পিয়ন। শুধু কি তাই প্রথম বে-বাছাই খেলোয়াড় হিসেবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বেকার। বেকারের আগে পশ্চিম জার্মানির কোনো খেলোয়াড় উইম্বলডন টেনিসে বিজয়ীর সম্মান লাভ করতে পারেন নি। তাই পশ্চিম জার্মানিতে বেকারকে জাতীয় বীরের সম্মান দেওয়া হচ্ছে।

খেলাধূলার জগতে এখন যাঁরা তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন

মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গলের খেলায় জামশেদ গোল করার চেষ্টা করছেন।

ভারতের তরুণ ব্যাটসম্যান মহম্মদ আজহারউদ্দিনের কাছে ভারত-শ্রীলংকার প্রথম টেস্ট ম্যাচটির গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। কারণ এর আগে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম তিনটি টেস্টেই সেঞ্চুরি করে তিনি এক বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। টেস্ট ক্রিকেটে আজহারউদ্দিনই একমাত্র খেলোয়াড় যিনি জীবনের প্রথম তিনটি টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন। চতুর্থ টেস্টটি তিনি খেলতে নেমেছিলেন শ্রীলংকার বিরুদ্ধে। সেই খেলায় সেঞ্চুরি তিনি করতে পারেন নি। প্রথম ইনিংসে ৭ আর

তাঁদের প্রায় সকলেরই বয়স কম। যেমন ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নস হয়েছেন রবি শাস্ত্রী। আজহারউদ্দিন জীবনের প্রথম তিনটি টেস্টে সেঞ্চুরি করে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন। গীত শেঠি বিশ্ব বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। চারবারের বিশ্ববিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার ৭৪ বছরের খেলোয়াড় বব মার্শালকে হার মানতে হয়েছে গীতের কাছে। এর পাশেই এসে যাবে বেকারের নাম।

ওদিকে এবারের অ্যাসেজ লড়াইয়ে ইংলণ্ড ৩-১ টেস্টে

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছে। ইংলন্ডে যে ছটি টেস্ট খেলা হলো তাতে বর্ডারের দল একটি ছাড়া আর কোনো টেস্টে তেমন সুবিধে করতে পারে নি। ইংলন্ডের অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ার দারুণ খেলেছেন। তাই তিনিই হয়েছেন 'ম্যান অফ দ্য সিরিজ'। ইংলন্ডের ইয়ান বথাম, গ্রাহাম গুচ, এলিসন, রবিনসন, এমবুরিরা রীতিমত ভালো খেলেছেন। ওঁদের সংগে পাল্লা দিতে পারেন নি বর্ডারের দলের খেলোয়াড়রা। তাই তো এই হার।

ভারত আবার অস্ট্রেলিয়ার সংগে খেলবে। ভারতকে শক্তিশালী দল নিয়েই অস্ট্রেলিয়ার মোকাবিলা করতে হবে। কারণ ইংলন্ডের কাছে হেরে অস্ট্রেলিয়া চাইবে ভারতকে হারিয়ে তাদের হারানো সম্মান কিছুটা ফিরে পেতে।

এবার শীতে কলকাতায় টেস্ট ম্যাচ নেই। আসছে বছরও নেই। আর তার পরের বছর তো বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল। শুধু তাই নয়–ফাইনালের পরেই হবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলের সংগে বাছাই বিশ্ব একাদশের খেলা। দর্শকরা এখন থেকেই ঐ দুটি খেলার টিকিট পাবার জন্যে বলাবলি শুরু করে দিয়েছেন।

গাভাসকার
ও
কপিলদেব

সৈয়দ কিরমানি রবি শাস্ত্রী

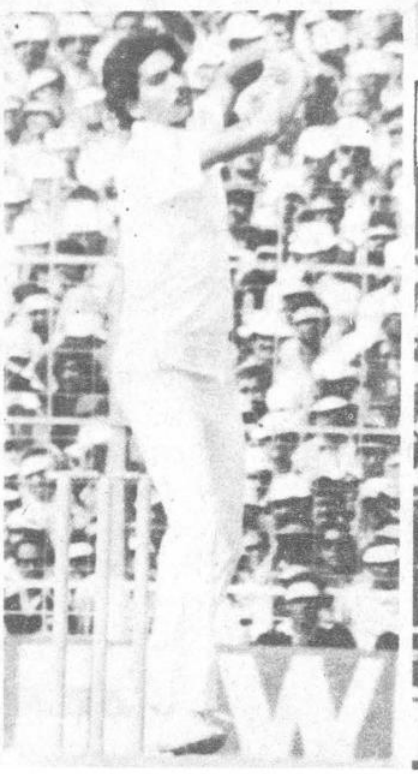

দিলীপ বেংসরকার

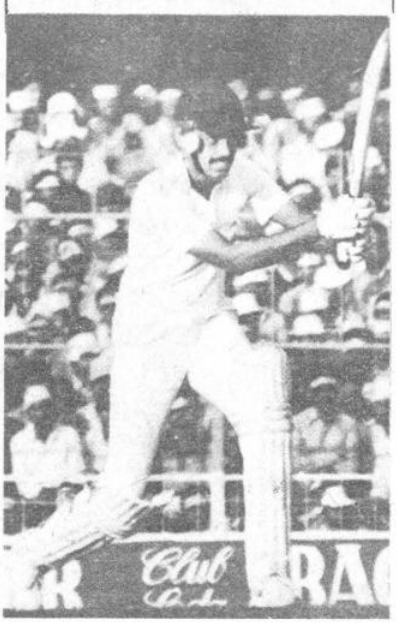

কমপিউটার টেস্ট

টেস্ট খেলা হয় মাঠে। মাঝে মধ্যে মাঠের বাইরেও তাক লাগানো খেলা হয়–যেমন হলো কিছুদিন আগে। কমপিউটার টেস্টে খেললো ডন ব্রাডম্যানের অস্ট্রেলিয়ার সংগে ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। ১৯৪৮ সালে ব্রাডম্যান যে দল নিয়ে ইংলন্ড সফরে গিয়েছিলেন কমপিউটার টেস্টে তাঁরাই ছিলেন অস্ট্রেলিয়া দলে। তাঁদের সংগে খেললো ১৯৮৪ সালে ক্লাইভ লয়েডের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া সফরে আসা দলটি।

অস্ট্রেলিয়া দলে ছিলেন ১৯৪৮ সালে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁরাই। দলে ছিলেন–ডন ব্রাডম্যান (অধিনায়ক), আর্থার মরিস, সিড বার্নস, কিথ মিলার, ব্রাউন, লিন্ডসে হ্যাসেট, জনসন, ডন টালন, রে লিন্ডওয়াল, তোশহ্যাক ও জনস্টন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ছিলেন–ক্লাইভ লয়েড (অধিনায়ক), গর্ডন গ্রিনিজ, ডেসমন্ড হেইন্স, রিচি রিচার্ডসন, ল্যারি গোমস, ভিভিয়ান রিচার্ডস, জেফ দুঁজো, ম্যালকম মার্শাল, জোয়েল গারনার, মাইকেল হোল্ডিং ও কোর্টনি ওয়ালস।

লয়েড টসে জেতেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ আগে ব্যাট করতে নেবে প্রথম ইনিংসে ২৫১ রান করে। হেইন্স আর রিচার্ডসন দ্বিতীয় উইকেটে ৯১ রান যোগ করেন। হেইন্স ৫৩ আর রিচার্ডসন করেন ৪০ রান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের নামকরা ব্যাটসম্যানদের বেশির ভাগই রান করতে পারেন নি। গোমস ০, গ্রিনিজ, রিচার্ডস আর লয়েড দশের ঘরেও পৌঁছুতে পারেন নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অবস্থা আরও শোচনীয় হতো–যদি না শেষ উইকেটে তাঁরা ৬৫ রান সংগ্রহ করতে পারতো। হোল্ডিং ৩৪ রান আউট হন।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা ক্যারিবিয়ানদের থেকে সামান্য ভালো ব্যাট করলেন। আর্থার মরিস ৭০ রান করলেন। অস্ট্রেলিয়ার আটজন ব্যাটসম্যান কুড়ির মতো রান করলেন। ১০ম উইকেটে তোশহ্যাক ও জনসন অমূল্য ৫৫ রান যোগ করলেন। সব থেকে সফল ক্যারিবিয়ান বোলার ছিলেন মার্শাল। ২১ ওভার বল করে ৭৯ রানের বিনিময়ে তিনি পেয়েছিলেন ৫টি উইকেট। অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংসে করলো ৩২৯ রান।

দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তুললো ৩৪৪ রান। তিনজন ব্যাটসম্যান করলেন সত্তরের ওপর। লয়েড ৭১, গোমস ৭২ ও হেইন্স করলেন ৭১ রান। তোশহ্যাক বোলিংয়ে আবার কৃতিত্ব দেখিয়ে ৭৩ রানে ৩টি উইকেট দখল করলেন। লিন্ডওয়ালও ৩টি উইকেট।

খেলার তখনও প্রায় দুদিন বাকি। জেতার জন্যে অস্ট্রেলিয়াকে করতে হবে ২৬৭ রান। দ্বিতীয় উইকেটেই অস্ট্রেলিয়া ১০০ রান সংগ্রহ করে জয়ের পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলো। মরিস করলেন ৭২। অস্ট্রেলিয়ার রান উঠলো দু উইকেটে ১৫০। মরিস আউট হতে কিথ মিলার এসে ব্রাডম্যানের সংগে যোগ দিলেন। এবং দু'জনে মিলে (অভংগ) তৃতীয় উইকেটে সংগ্রহ করলেন ১১৭ রান। এর মধ্যে ছিলো মিলারের ৩৮ আর ব্রাডম্যানের ১৩২ রান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঃ প্রথম ইনিংস–২৫১ (রিচার্ডসন ৪০, হেইন্স ৫৩, মার্শাল ২৪, দুঁজো ৪০, হোল্ডিং ৩৪, গারনার ১৯, ওয়ালস ১৮ অপরাজিত; তোশহ্যাক ৩০ রানে ৪টি, লিন্ডওয়াল ৮৯ রানে ১টি, মিলার ৪৮ রানে ১টি, জনস্টন ২৩ রানে ১টি ও জনসন ৫৫ রানে ১টি উই ঃ)

অস্ট্রেলিয়া ঃ প্রথম ইনিংস–৩২৯ (মরিস ৭০, ব্রাডম্যান ৪০, ব্রাউন ৪৫, জনসন ২৭, টালন ৩৪, লিন্ডওয়াল ২৭, তোশহ্যাক ২৯, জনস্টন ২৫; মার্শাল ৭৯ রানে ৫টি, হোল্ডিং ৭৯ রানে ২টি ও ওয়ালস ৬২ রানে ১টি উই ঃ)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঃ দ্বিতীয় ইনিংস–৩৪৪ (হেইন্স ৭১, গোমস ৭২, লয়েড ৭১, মার্শাল ৩৫; লিন্ডওয়াল ৬৭ রানে ৩টি, তোশহ্যাক ৭৩ রানে ৩টি, মিলার ৮৪ রানে ১টি ও জনস্টন ৬৯ রানে ২টি উই ঃ)

অস্ট্রেলিয়া ঃ দ্বিতীয় ইনিংস–২ উই ঃ ২৬৭ (মরিস ৭২, ব্রাডম্যান অপরাজিত ১৩২, মিলার ৩৮ অপরাজিত; হোল্ডিং ৫৭ রানে ১টি ও রিচার্ডসন ৫১ রানে ১টি উই ঃ)

অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ঃ ডন ব্রাডম্যান।

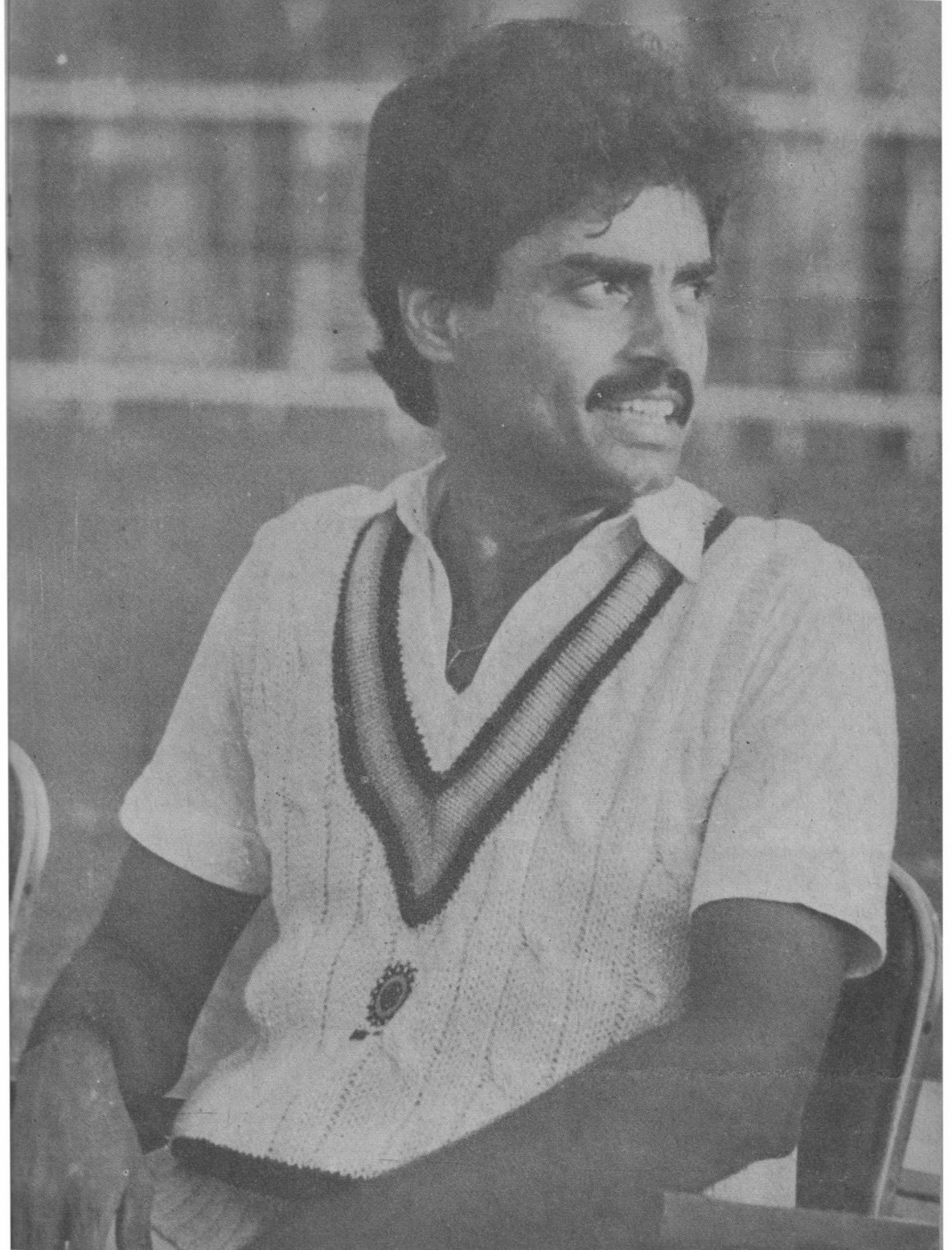

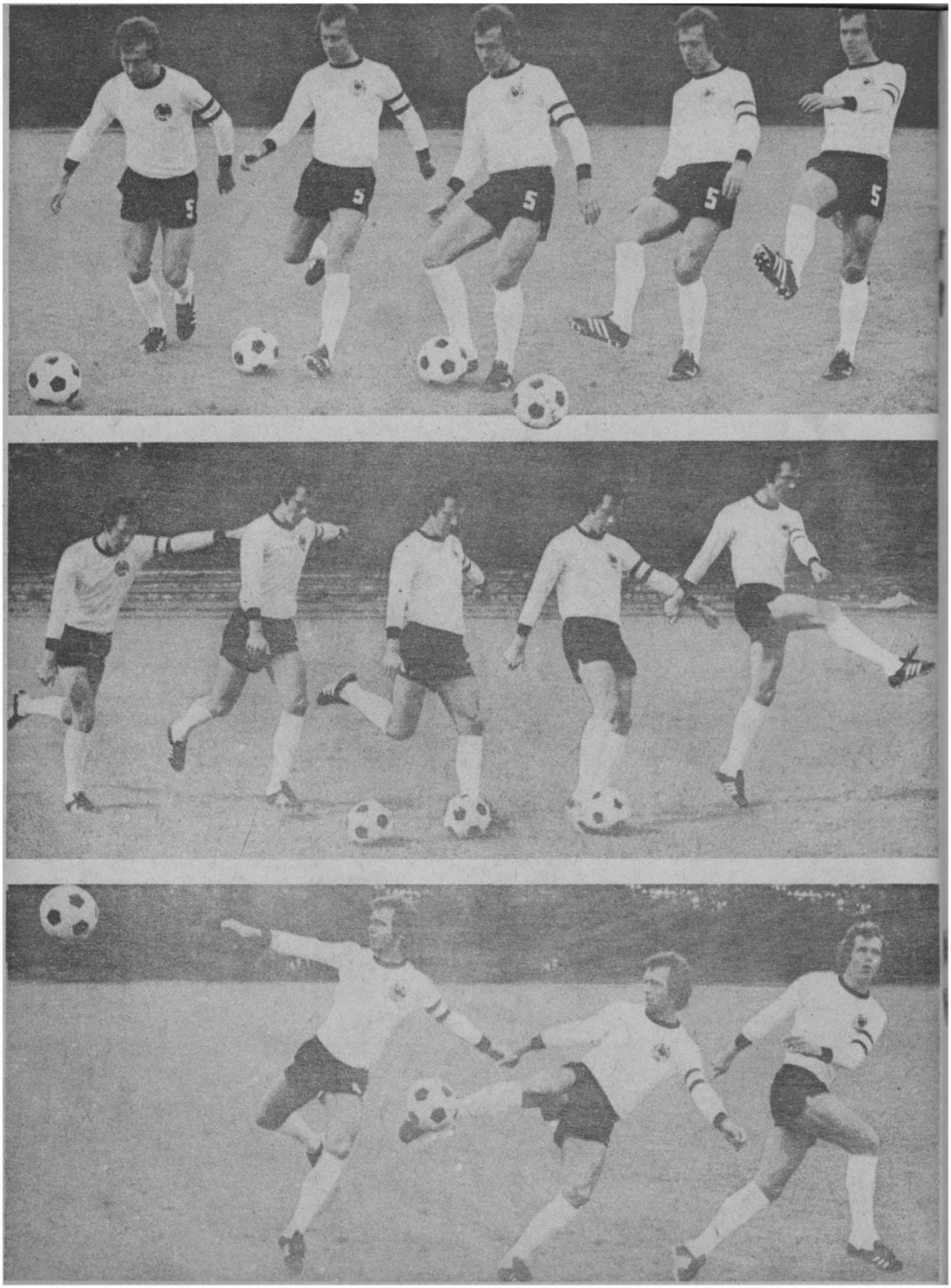

বল কিক করার নানা পদ্ধতি

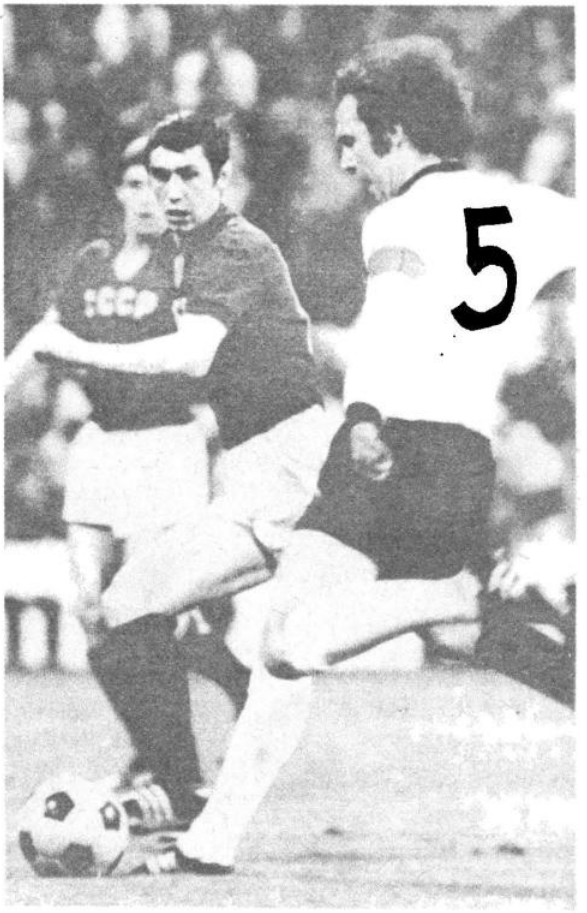

একটা ছেলে বল কিক করলে সে তার টো কিংবা পায়ের পাশ দিয়েই মারবে। অবশ্য প্রত্যেকে ঐ ভাবেই বল মারা শুরু করে। এদিক দিয়ে ছোটদের সংগে বড়দের কোনো তফাৎনেই। তবে আজকার দিনে একজন ভালো ফুটবল খেলোয়াড় কিক করার জন্যে তার পায়ের সব অংশই কাজে লাগায়। পায়ের ইনসাইড, আউটসাইড, ইনস্টেপ, গোড়ালি আর টো তো আছেই। এইভাবে পায়ের পাতার পুরো অংশ কাজে লাগিয়ে তারা সকলকে অবাক করে দেয়। কিকগুলো দারুণ কার্যকর হয়। তারা সরাসরি গড়িয়ে বল পছন্দ মতো জায়গায় পাঠাতে পারে, মাঠের বাইরে কিংবা শূন্যে উড়িয়ে দিতে পারে, তারা এমনভাবে কিক করতে পারে যাতে বলটা বাঁ দিক কিংবা ডান দিকে ধনুকের মতো বাঁক খেয়ে ঘুরে যেতে পারে। শুধু কি তাই এমন ভাবে স্পিন কক আজকাল করাচ্ছে যাতে বলটা মাটিতে পড়ে আবার ফিরে আসছে তাদের কাছে। ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্যের।

তবে এই সবই শিখে নেওয়া যায়। তোমরা যারা নিয়মিত অনুশীলন করো এবং পরিশ্রম করে সব কিছু রপ্ত করে নিতে চাও–তারা চটপটই এই সব অদ্ভুত কিকের গোপন কথা জেনে যাবে–শিখেও যাবে ঠিক কি ভাবে এই সব আশ্চর্যজনক কিকগুলো করতে হয় তার কায়দা।

কিক করার জন্যে তুমি কিভাবে বলের দিকে এগিয়ে যাবে সেইটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। যদি তোমার পাটা বলের পাশেই মাটির সংগে সেঁটে যায় (সট করার সময়) তাহ'লে সটটা যাবে নিচু হয়ে বা গড়িয়ে। তোমার পা যদি একটু দূরে অর্থাৎ আগের মতো মাটিতে সেঁটে বা গেঁথে না যায় তাহলে বলটা কিকের পর উঁচু হয়ে যাবে। যদি তুমি বলটা তোমার পায়ের মধ্যিখান দিয়ে মারো তাহ'লে বলটা সোজা সামনের দিকে যাবে। তুমি যদি বলটা তোমার পায়ের পাতার মধ্যিখানের বাঁদিক ঘেঁষে মারো তাহ'লে বলটা ডান দিকে এবং ডানদিক ঘেঁষে মারলে বাঁ দিকে যাবে। আসলে বলটা তুমি কোথায় পাঠাতে চাইছো সেইটাই সবার আগে ঠিক করা দরকার। তারপর বলটার দিকে তাকাও, যে পা দিয়ে মারবে সেই পায়ের মাসল বা মাংসপেশী শক্ত করো, পা তোলো তারপর যে দিকে মারতে চাও সেদিকে ঠিক ঠিক ভাবে তোমার পরিকল্পনা মতো কিক করো।

ওপরের ছবিটা দেখো। ১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগে খেলার সময় তোলা ঐ ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে বেকেনবাউয়ারের ডান পাটা বলের পাশে মাটিতে যেন গেঁথে আছে। শরীরের সব ভার ঐ পায়ের ওপর। বাঁ পাটা দেখো কিক নেবার জন্যে তৈরি। হাঁটুর কাছ থেকে বেঁকে আছে। বেকেনবাউয়ারের চোখ বলের ওপরে। তাঁর পছন্দমতো দিকে এবং ইচ্ছেমতো ভাবে বলটা মারার জন্যে তিনি প্রস্তুত।

এ সব সম্ভব হয়েছে অনুশীলন করে করে। তোমরাও পারবে। শুধু দরকার অনুশীলন আর পরিশ্রমের। পাশের পাতার ছবিগুলো দেখো। বেকেনবাউয়ার কিভাবে কিক করছেন, তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে দেখে তোমরাও চেষ্টা করো–দেখবে তোমরাও ঠিক পারবে।

ক্রিকেটের লর্ড–ক্লাইভ

(পাঁচ)

এমন যে হবে কেউ তা কল্পনাও করতে পারেন নি। এতো অল্প বয়সে সকলকে অনাথ করে লয়েড সাহেব যে চলে যাবেন তা কে ভেবেছিলো। ক্লাইভের মা সিলভিয়া থেলমা লয়েড দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ছোট ছোট সব ছেলেমেয়ে, এদের নিয়ে তিনি এখন কি করবেন? এক ডাক্তারবাবুর গাড়ি চালিয়ে কতোই বা রোজগার করতেন লয়েড সাহেব! এক পয়সাও সঞ্চয় নেই। তিনি একটা বাড়িতে কাজ করেন। রান্নাবান্না, কাপড় কাচা–এই সব, ক'টাকাই বা পান–তাতে কি সংসার চলে।

মাথায় তাঁর আকাশ ভেঙে পড়ে। ভেবে পান না কি করবেন! শেষকালে কি ছেলে মেয়ে নিয়ে তাঁকে উপোস করে দিন কাটাতে হবে?

বাড়ির বড় ছেলে ক্লাইভ। বয়েস মাত্তর ষোল। পড়াশোনায় ভালো। চেথাম স্কুলে বৃত্তি পেয়েছে। ওর বাবার ইচ্ছে ছিলো, ক্লাইভ আরও পড়ুক। কিন্তু তা কি আর হবে। মা একা কি করে এখন সংসার চালাবেন। সে বড় ছেলে। তারও তো একটা দায়িত্ব আছে। তাকে একটা কিছু করতেই হবে। পড়াশোনা মাথায় উঠলো। চাকরির ধান্ধায় ঘুরতে শুরু করলো ক্লাইভ।

খবর পেলো, জর্জ টাউন হাসপাতালে একটা কেরানির চাকরি খালি আছে। গিয়ে হাজির হলো ক্লাইভ।

ওকে দেখে সকলে অবাক। এতোটুকু ছেলে–ও আবার চাকরি করবে কি! ওর তো এখন পড়াশোনা করার কথা, খেলাধূলা করার কথা। ক্লাইভ বললো, সে তো লেখাপড়া করতেই চায়। স্কুলে বৃত্তি পেয়েছে। আর ক্রিকেট খেলতে ও খুব ভালোবাসে। খুব খারাপ খেলেও না। কিন্তু উপায় কি। হঠাৎ ওর বাবা মারা গেছেন। ওদের এখন না খেতে পেয়ে মরার দশা!

সব শুনে ক্লাইভকেই চাকরি দিলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। মাইনে অবশ্য তেমন কিছু নয়। মাসে ১৬ পাউন্ড। মানে তিনশ টাকার কাছাকাছি। তাতেই ভীষণ খুশি ক্লাইভ! ভাইবোনরা পেট ভরে খেতে পারছে। স্কুলে যেতে পারছে। মার মুখে হাসি ফুটেছে। আর কি চাই!

লেখাপড়ার পাট চুকে গেলো ক্লাইভের। হাসপাতালের কাজ আর ক্রিকেট খেলা–এই নিয়েই ক্লাইভ লয়েডের দিন কাটে। ওর মাসতুতো দাদা ল্যান্স গিবস তখন বেশ নাম করে ফেলেছে। দ্বীপে দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছে ওর খেলার কথা। ক্লাইভের ইচ্ছে, দাদার মতো নামকরা খেলোয়াড় হবার। গায়নার হয়ে ও খেলবে। সেঞ্চুরি করবে, কিন্তু তা কি আর হবে! ওকে এখন হাসপাতালে বসে বসে ওষুধের হিসেব লিখতে হবে। রোগীদের নাম ধাম লিখতে হবে। মনটা খারাপ হয়ে যায় ক্লাইভ লয়েডের।

লয়েড জানতো না ডি.সি.সি.র প্রথম বিভাগের দলের ক্যাপ্টেন ফ্রেড উইলসের চোখ ওর ওপর আছে। গত বছর ডি.সি.সি.র দ্বিতীয় বিভাগের একটা খেলায় ক্লাইভ খেলেছিলো। দারুণ খেলেছিলো সেই ম্যাচে। তার ব্যাটিং, বোলিং আর ফিল্ডিং দেখে উইলস ঠিক করে রেখেছিলেন, চান্স পেলেই ওকে প্রথম বিভাগে খেলাবেন।

হঠাৎই সেই সুযোগ এসে গেলো। এসে গেলো বড় তাড়াতাড়ি। সেদিন ফেস কাপে ডি.সি.সি.র সংগে জর্জ টাউন ক্রিকেট ক্লাবের খেলা। খেলা হবে বোউরদায়। এই মাঠেই টেস্ট খেলা হয়। মাঠের চারদিকে বড় বড় গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ রকমই একটা গাছের ডালে বসে ক্লাইভ দেখেছিলো ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগে

পাকিস্তানের টেস্ট (১৯৫৭-৫৮ সালে) খেলা। সেই খেলায় সেঞ্চুরি করেছিলেন ওর আদর্শ গ্যারি সোবার্স।

মাঠে এসে স্লাইভ চারদিকে দেখছিলো। ও তো আর খেলবে না। একটু পরেই খেলা আরম্ভ হবে। ও স্কোর লিখবে। খেলোয়াড়রা তৈরি হচ্ছিলেন। স্লাইভ চুপচাপ বসে দেখছিলো মাঠটা। এই মাঠে খেলা ওর স্বপ্ন। গ্যারি সোবার্স, ফ্রাঙ্ক ওরেলরা এই মাঠে খেলেছেন। খেলেছেন বিশ্বের সেরা সব খেলোয়াড়রা। সেই মাঠে এখন স্লাইভ। দেখে দেখে যেন ওর আশ মেটে না।

তখনই ঘটলো ঘটনাটা। ডি.সি.সি.র ন্যাটা ব্যাটসম্যান মুর তখনও মাঠে আসেন নি। খেলা আরম্ভ হবার ঠিক আগে এসে বলে গেলেন, তিনি খেলতে পারবেন না।

কি মুশকিল! এখন কে খেলবে মুরের বদলে? উইলস ঠিক করে ফেললেন কে খেলবে। স্লাইভকে ইশারায় কাছে ডাকলেন।

স্লাইভ তুমি আজ খেলবে!

শুনে আকাশ থেকে পড়লো স্লাইভ। এই মাঠে সে খেলবে? নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে। স্লাইভকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উইলস বললেন, কি হলো দাঁড়িয়ে আছো কেন? রেডি হও গে!

স্লাইভের পিঠ চাপড়ে দিয়ে অধিনায়ক উইলস চলে গেলেন। আর আনন্দে নেচে উঠতে গিয়ে দমে গেলো স্লাইভ। ও তো জামা-প্যান্ট কিছু আনে নি। জানতো ও শুধু খেলা দেখতেই মাঠে যাচ্ছে। খেলতে হবে তো ভাবে নি। কি হবে এবার? এতোবড় সুযোগটা পেয়েও শেষকালে হারাবে? শুধু কি তাই জর্জ ক্যামাচো, কলিন হেরন, নরম্যান রাইট, লেনি টমাসের মতো নামকরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাওয়াও কি চাট্টিখানি কথা! সেই সুযোগ সে হারাবে?

কাঁদতে ইচ্ছে করছে স্লাইভের। বাড়ি গিয়ে সে জামা-প্যান্ট নিয়ে আসবে সে সময়ও আর নেই। এগিয়ে এলেন মাসতুতো দাদা ল্যান্স গিবস। তাঁর একটা প্যান্ট পরলো স্লাইভ। ঠিক হলো না। এতকাল কেডস পরে খেলেছে স্লাইভ। কিন্তু আজ তো তাও আনে নি। গিবস এগিয়ে দিলে তাঁর এক জোড়া বুট। বেশ বড় হলো। জীবনে ক্রিকেট সু পরে নি। যেদিন পরলো সেদিন তাকে একটা বেঢপ সাইজের বুট পরতে হলো। হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে। তারপর হাতে তুলে নিলো ল্যান্স গিবসের ব্যাটটা। ব্যাটটার ওপর ইংলন্ডের অধিনায়ক লেন হাটন আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের এভারটন উইকসের অটোগ্রাফ।

ঐ পোশাক পরে ভয়ে ভয়ে ব্যাট করতে নামলো ষোল বছরের স্লাইভ লয়েড। নর্মান রাইট তখনকার দিনের নামকরা বোলার। স্লাইভের মতো কচি ব্যাটসম্যান পেয়ে তিনি রাউন্ড দ্য উইকেট বল করতে গেলেন। টেনে টুনে মিনিট কুড়ি উইকেটে ছিলো স্লাইভ। করলো ১২ রান। তারপর রাইটের একটা বলে বোকা বনে আউট হয়ে গেলো। বলটা যে কোথা দিয়ে ঘুরে কি ভাবে তার উইকেট ভেঙে দিলো ও মোটে বুঝতেই পারে নি।

ফিল্ডিংয়ের সময় আরও বিচ্ছিরি ব্যাপার। বড় প্যান্ট আর বড় ক্রিকেট স্যু পরে সে না পারে ছুটতে, না পারে ঠিকভাবে দাঁড়াতে। ফলে যা কোন দিন হয় না তাই হতে লাগলো। তার হাত গলে পড়তে লাগলো একটার পর একটা ক্যাচ।

ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেলো স্লাইভের। কোন রকমে চোখের জল চেপে বাড়ি ফিরে গেলো সে। দাদা গিবস শুধু বলেছিলেন, ঘাবড়াস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু পরদিন সকালে কাগজ পড়তে গিয়ে কেঁদে ফেলার দশা স্লাইভের। সে দিন রবিবার। চার্লস চিসেস্টার গায়নার নামকরা ক্রিকেট-লেখক। শনিবারের খেলাটির কথা লিখতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

নতুন ছেলেটি, যার নাম স্লাইভ লয়েড, সে কোনদিনই বড় খেলোয়াড় হতে পারবে না। ওর খেলা দেখে মনেই হয় নি যে ও কোনদিন নামকরা খেলোয়াড় হতে পারবে। ও ব্যাট করতে পারে নি। ক্যাচ ফেলেছে দেদার।

আর একটা কাগজে রবার্ট ক্রিস্টিয়ানি লিখলেন, নতুন ছেলেটিকে দেখে হতাশ হয়েছি। ও কি কোনদিন নামকরা খেলোয়াড় হতে পারবে? মনে তো হয় না। ওর ফিল্ডিং যাচ্ছেতাই। ব্যাটিংও তাই। এই জন্যেই ডি.সি.সি.র খেলোয়াড়রা কখনো ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে চান্স পায় না।

কাগজ দুটো পড়ে মন ভেঙে গেলো ষোল বছরের স্লাইভ লয়েডের। দুঃখও হলো খুব। ওর অবস্থাটা কেউ একবার চিন্তাও করলেন না। ওর পোশাক ছিলো না, জুতো ছিলো না। দাদার জামা-প্যান্ট আর জুতো পরে ও খেলতে নেমেছিলো। সব বড় হয়েছিলো। ঐ ভাবে কখনো ক্রিকেট খেলা যায়!

কাগজ দুটো পড়ে ও ঠিক করে ফেললো, আর ক্রিকেট খেলবে না। ক্রিকেট খেলা ওর জন্যে নয়। হাসপাতালে চাকরি করছে—তাই করবে।

রবিবার ওরা সারাদিন ক্রিকেট খেলে। স্লাবের খেলা না থাকলে হয় পাড়ায়, না হয় সমুদ্রের ধারে গিয়ে খেলে। কিন্তু স্লাইভ সেদিন বাড়ি থেকেই বেরুলো না। বন্ধুরা এসে ডেকে ডেকে ফিরে গেলো। স্লাইভ ঘরের মধ্যে মুখ গোঁজ করে বসে রইলো।

কেউ কিন্তু টেরও পেলো না, ওর দু চোখে জল টল টল করছে।

[চলবে]

প্রশ্ন ঃ

(১) আধুনিক হকি খেলার উদ্ভব কোথায় হয় ?
(২) ভারতের কোন গ্রামকে 'নারসারি অফ হকি প্লেয়ার্স' বলা হয় ?
(৩) ভারত কোন সালে প্রথম ওলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় খেলেছিলো ? সেই দলের অধিনায়ক কে ছিলেন ?
(৪) আন্তর্জাতিক হকিতে সব থেকে বড় ব্যবধানের হারজিৎ হয় কোন ম্যাচে ?
(৫) সিংগলস খেলার সময় টেনিস কোর্টের মাপ কতো ?
(৬) এঁরা কোন দেশের খেলোয়াড় ছিলেন (ক) পুসকাস (খ) ডি স্টিফানো (গ) ডি ডি ?
(৭) কাইজার ফ্রাঞ্জ কাকে বলা হয় ?
(৮) যেবার ওলিম্পিকে প্রথম ফুটবল খেলা হয়েছিলো সেবার কে জিতেছিলো ?
(৯) সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা কবে শুরু হয়েছে ?
(১০) বিশ্বের সব চেয়ে পুরনো ফুটবল ক্লাব কোনটি ?
(১১) প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান কে করেছেন। কতো ?
(১২) রণজি ট্রফিতে কোন বোলার এক ইনিংসে দশটি উইকেট পেয়েছেন ?
(১৩) কবে এবং কোথায় ভারতের সংগে শ্রীলংকার প্রথম বেসরকারী টেস্ট খেলা হয়েছিলো ?
(১৪) ঐ খেলায় দু দলের অধিনায়ক কে কে ছিলেন ?
(১৫) রণজি ট্রফিতে প্রথম হ্যাটট্রিক করেছেন কে ?

স্পোর্টস কুইজ

উত্তর ঃ

(১) ইলংন্ড
(২) পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলার সংসারপুর গ্রামকে।
(৩) ১৯২৮ সালে। জয়পাল সিং।
(৪) ১৯৩২ সালে ওলিম্পিকে ভারতের সংগে আমেরিকার খেলায় ভারত ২৩ গোলে জিতেছিলো।
(৫) ৭৮ ফুট লম্বা, ২৭ ফুট চওড়া।
(৬) (ক) হাংগেরি, (খ) আর্জেন্টিনা, (গ) ব্রাজিল
(৭) ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ার। ১৯৭৪ সালের বিশ্বকাপ বিজয়ী পশ্চিম জার্মানি দলের অধিনায়ক ছিলেন।
(৮) ইংলন্ড
(৯) ১৯৬০ সালে।
(১০) ইংলন্ডের শেফিল্ড ফুটবল ক্লাব। ২৪ অক্টোবর ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত।
(১১) ৪৯৯ রান। হানিফ মহম্মদ ১৯৫৮-৫৯ সালে করাচির সংগে 'ভাওয়ালপুরের খেলায় করেছিলেন।
(১২) বাংলার প্রেমাংশু চ্যাটার্জি। ১৯৫৬ সালে আসামের বিরুদ্ধে।
(১৩) ১৯৩২-৩৩ সালে দিল্লিতে।
(১৪) ভারতের সি. কে. নাইডু। শ্রী লংকার সি. এ. ইচ. গুণশেখর।
(১৫) বাঁকা জালানি। ১৯৪৪ সালে। নর্থ ইন্ডিয়া ও সাউথ পাঞ্জাবের খেলায়।

গল্প হলেও সত্যি

অনেক, অনেক দিন আগের কথা।

কলকাতায় তখন কোম্পানির রাজত্ব। সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা গ্রাম তিনটি জমিদার সাবর্ন চৌধুরীর কাছ থেকে কিনে নিয়ে গংগার ধারে নতুন শহরের পরিকল্পনা করেছিলেন জোব চার্নক।

তারপর থেকে কলকাতা আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে। লন্ডনের মতো করে একটি একটি বাড়ি তৈরি করেছেন সাহেবরা। জংগল কেটে সাফ করেছেন, খাল-বিল এঁদো পুকুর বুজিয়ে রাস্তা ঘাট তৈরি হয়েছে। বাড়ি হয়েছে। কলকাতা বেড়েছে আস্তে আস্তে।

সাহেবরা থাকতেন চৌরংগী-পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে। তখন অবশ্য জায়গাগুলো অন্যরকম ছিলো। বলা হতো সাহেব পাড়া। বাঙালীরা ওদিক মাড়াতেন না। সাহেবদের অঞ্চল পার হলেই ঘন জংগল। তখনো সেই জংগলে বাঘ ছিলো। ডাকাত ছিলো। কাপালিকরা ছিলো। কালীঘাটের মায়ের মন্দিরে যেতে হলে দল বেঁধে যেতে হতো।

সাহেবদের একটা দল থাকতো বালীগঞ্জের ওদিকে। বালীগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবের মাঠে ক্রিকেট খেলা হতো। আর এসপ্লানেডে ইডেন সাহেবের বোনদের বাগান ইডেন উদ্যানেও খেলা হতো। একবার ইডেনে সাহেবদের খেলা পড়লো বালীগঞ্জের ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের সংগে। ইডেনে সবাই তৈরি হয়ে বসে আছেন। আম্পায়াররা এসে গেছেন। কিন্তু সি.সি.সি দল আর আসে না। বেলা গড়িয়ে গেলো তবু এলো না।

তাই সেদিন আর খেলাও হলো না। সাহেব-মেমরা চিন্তিত। কি হলো ওদের। খবর পাওয়া গেলো পরের দিন। বাঘের ভয়ে বালীগঞ্জ থেকে ওঁরা ইডেনে আসতে পারেন নি। সাহেবরা আসতেন রক্ষীদের সংগে নিয়ে। সেদিন বালীগঞ্জে সাহেবরা রেডি হয়ে বসে আছেন কিন্তু রক্ষীরা আর আসে না। আর বাঘের ভয়ে খেলোয়াড়রাও ইডেনের দিকে যেতে পারেন না। সেদিন রক্ষীরা আসে নি। তাই তাঁদেরও আর যাওয়া হয় নি। খেলাও হয় নি।

এই সংখ্যার সব ছবি সুমন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা

শাওলী ব্যানার্জি (কল্যাণী, নদীয়া)

প্রশ্নঃ বেনসন হেজেস কাপ জয়ী ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের সই শুকতারায় চাই।

উত্তরঃ ছাপার চেষ্টা করা হবে।

মলি রায় ও সুশোভন দে (শ্রীধর রায় রোড, তিলজলা)

প্রশ্নঃ দিব্যেন্দু বড়ুয়া কতো বছর বয়সে প্রথম আন্তর্জাতিক খেলায় নামেন ?

উত্তরঃ পনেরো বছর।

কাকলী পাল (সাঁইকিয়া, বীরভূম)

উত্তরঃ আজহারউদ্দিনের ছবি তো ছাপা হয়ে গেছে। তুমি অন্য ছবি পাঠাও। শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুমি শুকতারার ঠিকানায় চিঠি দিতে পারো।

নিবেদিতা আদিত্য (পূর্ব সিঁথি রোড, দমদম)

প্রশ্নঃ রবি শাস্ত্রীর ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তরঃ রবি শাস্ত্রী, C/o বোম্বাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন, ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়াম, বোম্বাই– এই ঠিকানায় চিঠি লিখলে রবি পাবেন।

তোমাদের জিজ্ঞাসা

রাজু (রাঁচী, ধূরসা)

প্রশ্নঃ বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান ও বোলারের নাম জানতে চাই।

উত্তরঃ সেরা ব্যাটসম্যান–ভিভিয়ান রিচার্ডস। সেরা হিসেবে একজন বোলারের নাম করা মুশকিল। পেস ও স্পিন বোলারের ব্যাপারটা আছে তো!

অরূপ সাহা (মুরারিপুকুর, উল্টাডাঙা)

উত্তরঃ তোমার গড়া শ্রেষ্ঠ ভারতীয় দলটি হলো–ভিনু মানকড়, সুনীল গাভাসকার (অধিনায়ক), লালা অমরনাথ, টাইগার পাতৌদি (সহ-অধিনায়ক), দিলীপ সারদেশাই, বিজয় মঞ্জরেকার, কপিলদেব, কিরমানি (উইকেটরক্ষক), বিষেণ সিং বেদী; এরাপল্লি প্রসন্ন ও ভাগবৎ চন্দ্রশেখর।

অরিন্দম ভট্টাচার্য (থানাপাড়া, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্নঃ টেস্ট ক্রিকেটে কোন কোন ক্রিকেটার প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি করেছেন!

উত্তরঃ অনেক। তুমি কোন দেশের জানতে চাও ? নিশ্চয়ই ভারতের। ভারতের পক্ষে জীবনের প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি করেছেন–লালা অমরনাথ, দীপক শোধন, কৃপাল সিং, হনুমন্ত সিং, আব্বাস আলি বেগ, জি আর বিশ্বনাথ, সুরিন্দর অমরনাথ ও আজহারউদ্দিন।

স্টার ট্রেক

রন হ্যারিস ও শ্যারমান ডিভোনো

ক্যাপটেন, এতো প্রতিফলিত রূপ।
তোমরা আমায় নয় ধ্বংস করেছো একটি কমপিউটারকে। ও ছিলো আমার সংবাদবাহক। ও আমার হয়ে কাজ করতো। যখন আমি বিশ্ব
ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করতাম জীবনের রহস্য জানার জন্যে

আমি...ইলিকনা...ক'য়েকশ বছর আগে আমি আমার লোকজনদের নিয়ে ইসকোনিয়ায় গিয়েছিলাম।

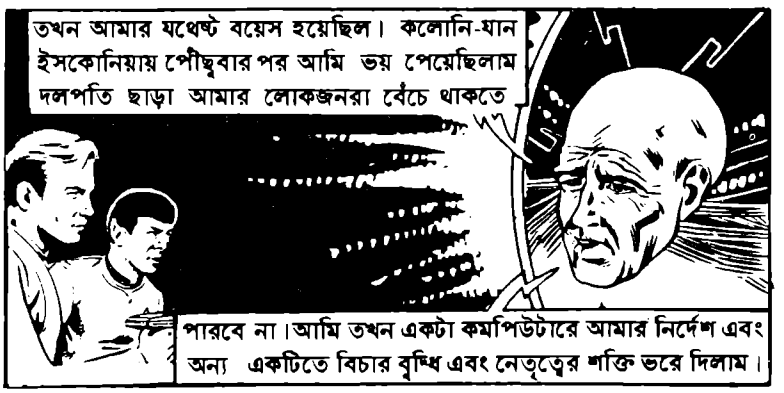
তখন আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছিল। কলোনি-যান ইসকোনিয়ায় পৌঁছুবার পর আমি ভয় পেয়েছিলাম দলপতি ছাড়া আমার লোকজনরা বেঁচে থাকতে
পারবে না। আমি তখন একটা কমপিউটারে আমার নির্দেশ এবং অন্য একটিতে বিচার বুদ্ধি এবং নেতৃত্বের শক্তি ভরে দিলাম।

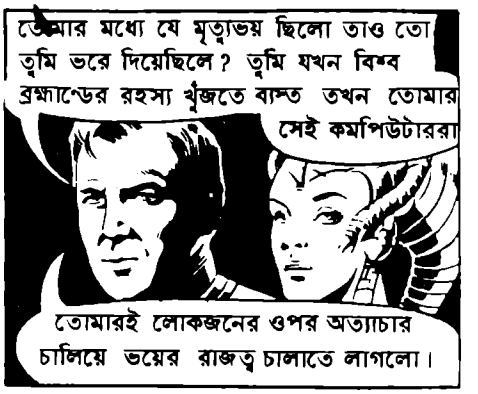
তোমার মধ্যে যে মৃত্যুভয় ছিলো তাও তো তুমি ভরে দিয়েছিলে? তুমি যখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য খুঁজতে ব্যস্ত তখন তোমার সেই কমপিউটাররা
তোমারই লোকজনের ওপর অত্যাচার চালিয়ে ভয়ের রাজত্ব চালাতে লাগলো।

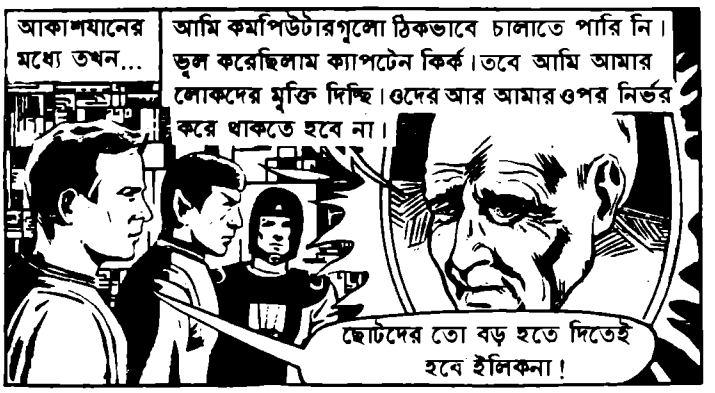
আকাশযানের মধ্যে তখন...
আমি কমপিউটারগুলো ঠিকভাবে চালাতে পারি নি। ভুল করেছিলাম ক্যাপটেন কির্ক। তবে আমি আমার লোকদের মুক্তি দিচ্ছি। ওদের আর আমার ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে না।
ছোটদের তো বড় হতে দিতেই হবে ইলিকনা!

তখন শহরে...
আরে এসব কী হচ্ছে...রোবটগুলো যে মরে যাচ্ছে...
রোবটরা মরে না...ওদের নষ্ট করে ফেলা হয়...তাহ'লে আমরা মুক্ত...আমরা মুক্ত...মুক্ত...
DIST. BY ASIA FEATURES
All Rights Reserved Dist by L.A. Times Synd
©1982 Paramount Picture Corp

[চলবে]

অলৌকিক

নন্দলাল ভট্টাচার্য

রাম, লক্ষ্মণ–দুই ভাই। যমজ ওরা। মা'র কোলে শুয়ে গল্প শুনছে দু'জনে। মা বলে চলেছেন রামায়ণের কাহিনী। শুনতে শুনতে এক আশ্চর্য জগতে যেন পৌঁছে যায় তারা। একসময় রাম বলে, মা–এ যে শুধু আমার আর লক্ষ্মণের কথাই বলছ।

মা কমলাদেবী হেসে বলেন, হ্যাঁ বাবা, রামায়ণে যে তোমার আর লক্ষ্মণের কথাই রয়েছে বেশি।

আমরাই রাম লক্ষ্মণ–না মা?

হ্যাঁ, তোমরাই আমার রাম লক্ষ্মণ। মা হাত বুলিয়ে দেন তাদের মাথায়। একসময় ঘুমিয়ে পড়ে দুই ভাই।

খুব বড়লোক না হলেও রাম-লক্ষ্মণদের অবস্থা তেমন খারাপও নয়। বাড়িতে পাত পড়ে বেশ কয়েকটি। ঠাকুর সেবাও আছে। সবই কিন্তু চলে যায়–কুলিয়ে যায়। ওদের বাবা রাধামাধব গ্রামের একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি। অর্থ নয়, পান্ডিত্য আর তাঁর ধর্মপরায়ণতাই তাঁকে এনে দিয়েছে এই সম্মান। মা কমলাদেবীকেও ভালবাসে সবাই। অমন দয়ালু মহিলা যে বড় একটা দেখা যায় না।

দুই ভাই-ই ভারি শান্ত। হৈ-হল্লায় তারা নেই। সব সময় কেমন যেন গম্ভীর। মনে হয় দিনরাত্তির কী যেন ভাবছে তারা। এমনিতে খেলাধুলো তাদের ভালো লাগে না। আনন্দ পায় তারা পুজো পুজো খেলায়। হ্যাঁ, মাটি দিয়ে তারা তৈরি করে আশ্চর্য সব ঠাকুর দেবতার মূর্তি।

এইসব পুজোয় রাম হয় পুরোহিত আর লক্ষ্মণ তার সহকারী। কতই বা বয়স তখন তাদের–ছয়-সাত। কিন্তু পাকা পুরোহিতের মতো পুজো করে রাম। আর রামনাম গাইতে গাইতে যেন বিভোর হয়ে যায় লক্ষ্মণ।

দিন যায়। বছর আট নয়ের সময় পৈতে হল রামের। সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হলো সে। আর তারপর থেকেই তাকে কেন্দ্র করে ঘটতে লাগল নানা অলৌকিক ঘটনা। প্রথম প্রথম কেউ তাতে তেমন গুরুত্ব দিত না, ভাবত এ সব কাকতালীয়। কিন্তু বারবার তো আর কাকতালীয় ঘটনা ঘটতে পারে না। তাই আস্তে আস্তে বিশ্বাসের ভিতটা পাকা হতে থাকে। রামকে তারা বেশ একটু সমীহ করেই চলতে শুরু করে। রামের কিন্তু সেদিকে তেমন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে থাকে তার ভাবে–চুপচাপ নির্জনতার মধ্যেই তার আনন্দ।

রামের যখন আট বছর বয়স সেই সময় মারা গেলেন রাধামাধব। আর তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই ইহলোক ত্যাগ করেন রাধামাধবের গুরুদেব মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চানন। মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চাননও খুব ভালবাসতেন রামকে। তাকে কাছে পেলে বৃদ্ধের হৃদয় যেন ভরে উঠত অপার আনন্দে। আর রামও বাবার গুরুদেবের কাছে এলেই অন্তরে অনুভব করত একটা প্রেরণা। এখন অল্পদিনের মধ্যেই দুই প্রিয়জনের মৃত্যুতে স্বভাব-গম্ভীর রাম যেন হয়ে যায় আরো গম্ভীর। কিছুতেই সে আনন্দ পায় না, কিছুই তার ভাল লাগে না।

বাড়ির সবাই ভাবে, রাম কি তবে বিবাগী হয়ে যাবে? মা কমলাদেবীর কিন্তু বিশ্বাস, রাম একদিন মানুষের মতো মানুষ হবে। অনেক লোক তাকে মানবে।

দিন যায়। রাম যেন ক্রমেই সংসার থেকে দূরে সরে যায়। এমনি সময় তার এক পিসিমা এসে তাকে বলে, রাম, আমার সঙ্গে যাবি?

কোথায়?

চন্দ্রনাথে।

ঘরকুনো রাম কিন্তু এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল। ফরিদপুরের ডিঙামানিক থেকে পিসি ভাইপোতে চললেন চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে–চন্দ্রনাথ শিব দর্শনে। যাতায়াতের ব্যবস্থাটা তখন ঠিক এখনকার মতো সহজ ছিল না। বেশ কষ্ট করেই যেতে হতো চন্দ্রনাথে। রামের কিন্তু সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। বরং সেই সাহস জোগায় পিসিকে। একসময় তারা পৌঁছোয় চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। পাহাড়ের মাথায় চন্দ্রমৌলি শিবের মন্দির। পায়ে হেঁটে উঠতে হয়। খাড়া পাহাড়। পিসি ভাইপোতে একসময় এসে পৌঁছোয় পাহাড়ের মাথায়।

পাহাড়ে উঠেই কিন্তু পিসির মাথায় হাত। রামকে ডেকে তিনি বলেন, ওরে রাম, এখন কী হবে?

কেন, কী হয়েছে?

হবে আর কি, হয়েছে আমার মাথা আর মুন্ডু। আর

তুই-ও আচ্ছা ছেলে বাবা। একবার মনে করাতে তো পারতিস।

পিসির কথার কোনো অর্থ খুঁজে পায় না রাম। সে বলে, কী হয়েছে পিসি তাই তো আগে বলবে।

বলব আর কী! বলি বেলপাতা এনেছিস?

বারে, সে তো তুমি আনবে।

তাই তো আনব, কিন্তু ভুলে গেছি যে এখন কী হবে?

কী আর হবে, এখান থেকে বেলপাতা নিয়ে নাও।

পাওয়া গেলে কি আর নিতাম না রে। কিন্তু পাহাড়ের মাথায় যে কোথাও বেলপাতা পাওয়া যায় না। বেলপাতা যে সেই পাহাড়ের নিচে। তবে কি আমার আর শিবপুজো করা হবে না?

পিসি একবারে হায় হায় করে ওঠে। তখন চন্দ্রনাথ পাহাড়ের ওপর কোনো বেলগাছ ছিল না, আর একবার পাহাড়ের মাথায় উঠে আবার নেমে বেলপাতা এনে পুজো দেওয়াটাও বড় সহজ ব্যাপার নয়। তাই পিসি তো হায় হায় করবেনই। রাম তবু নির্বিকার।

তার হাবভাব দেখে একবার পিসির মন জ্বলে ওঠে, ছেলেটা কি তার অবস্থাটা বুঝতে পারছে না? আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, তাই বা কেমন করে হবে? এ ছেলে তো বড় সহজ নয়। এ ছেলেকে ধরলে নিশ্চয় তাঁর একটা উপায় হবে। তাই সে বলে, ওরে রাম, যা হয় একটা ব্যবস্থা কর।

বারে, আমি কী করব? এই পাহাড়ে বেলপাতা আমি পাবো কোথায়?

ওসব কথা আমি শুনছি না। আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর বাবা।

পিসির কথায় রাম বলে, আমার করার কিছু নেই। তুমি পিসি বেলপাতা ছাড়াই পুজো কর।

বাজে কথা বলিস না বাবা। এবারের মতো আমায় উদ্ধার কর বাবা। না হলে এতদূর এসেও বাবা চন্দ্রনাথের পুজো না করেই কি আমায় ফিরতে হবে রে। বলতে বলতে কেঁদে ফেলে পিসি।

পিসির কান্না দেখে বুঝি মন ভেজে ভাইপোর। সামনের একটা পাথর দেখিয়ে সে বলে, ওই পাথরটা ঠেলে সরাও—তাহলেই বেলপাতা পাবে।

রামের সে কথায় পিসি ভরসা পায় না। ভাবে, তাই কখনও হয়। পাথরের তলায় কখনও বেলপাতা থাকতে পারে। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়, কি জানি বাবা, এ ছেলে বড় সহজ নয়, অনেক কিছুই তো করেছে—দেখিই না একবার ওর কথা শুনে। তারপর ঠেলে সে পাথরটা

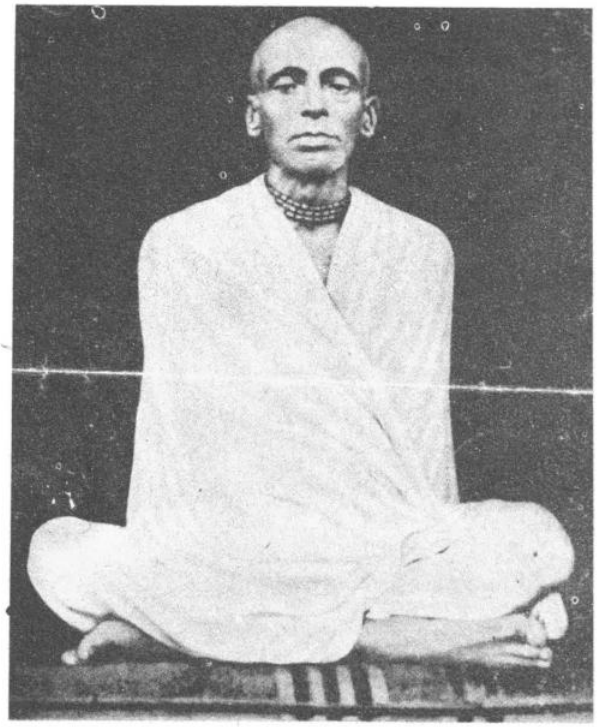

সরায়। পাথরটা সরিয়েই পিসি চিৎকার করে ওঠে, ওরে রাম রে—তুই আমার সত্যিকারের রামচন্দ্র রে। তুই-ই আমার ঠাকুর।

রামচন্দ্র তখন কিন্তু বসে বসে হাসছে। সে বলে, কেন পিসি, কী হলো?

এই দেখ, পাথরের তলায় রয়েছে ছোট্ট একটা বেলগাছ। কী তাজা সবুজ পাতাগুলো! এই পাহাড়ের বুকে পাথরের নিচে কি বেলগাছ হয় রে—এ সবই তোর খেলা।

কি যে বল পিসি। তুমি চন্দ্রনাথের মাথায় বেলপাতা চাপাবে বলে অত ডাকছিলে তাই বাবা চন্দ্রনাথই তোমার জন্য এই বেলপাতা রেখে দিয়েছেন।

এর উত্তরে পিসি সেদিন আর কিছু বলেনি। শুধু কেঁদেছেন আর সেই বেলপাতা তুলে সাজিতে ভরেছেন—পরে চোখের জলে ভিজিয়ে তাই চাপিয়েছেন শিবের মাথায়।

এমন অঘটন ঘটিয়েছিল সেদিন যে রামচন্দ্র—তিনি বড় হয়ে একদিন ভারতের সাধন জগতে পরিচিত হন রাম ঠাকুর নামে। রাম ঠাকুরের নানা অলৌকিক লীলা দেখে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় নত হয়েছিল—আজো হচ্ছে অসংখ্য মানুষের মাথা।

পিকু আর ভিখু

সর্বাণী সাধুখাঁ

পিকুর সঙ্গে ভিখুর পরিচয়টা একদিন হঠাৎই ঘটে গিয়েছিলো।

পিকু ক্লাস ফোরে পড়ে। সেদিন হোমটাস্কের খাতা নিয়ে যেতে ভুলে গেছে বলে থার্ড পিরিয়ডে অঙ্কের মাস্টারমশাই-র কাছে খুব বকুনি খেল। ফলে ওর মনটা ভারী হয়ে থাকে। টিফিনের সময় সে কিছু খেতেই পারে না। মা আলুভাজা আর লুচি করে দিয়েছিলো। স্কুলের গেটের কাছে গিয়ে সে রাস্তায় লুচি আর আলুভাজাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে একটা নেড়ি কুকুরের বাচ্চা ছুটে আসে। কয়েকমুহূর্ত সে পিকুর দিকে তাকায়, তারপরই একখানা লুচি মুখে নিয়ে চিবোতে থাকে। পিকু দেখেও ঠিক দেখে না। আস্তে আস্তে ওখান থেকে চলে আসে। ছুটির পর সে স্কুল থেকে বেরোচ্ছে অমনি একটা কুকুরবাচ্চা এসে তার পা চাটতে শুরু করে। পিকু দেখে, সেই কুকুরের বাচ্চাটা। ওকে তখন লুচি দিয়েছে বলে তার পা চেটে ভালবাসা জানাচ্ছে। পিকুও বাচ্চাটার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দেয়।

পরদিন টিফিন খেতে গিয়েই পিকুর সেই কুকুরবাচ্চাটার কথা মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সে গেটের কাছে যায়। বাচ্চাটা কোথায় ছিল কে জানে। পিকুকে দেখেই গেটের কাছে ছুটে আসে। পিকু ওর দিকে একটা লুচি ছুঁড়ে দেয়। কুকুরটা সেটা নিয়ে চিবোতে থাকে। পিকু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে আর বাকি লুচিগুলো নিজে খায়।

সেদিন স্কুল ছুটির পর কুকুরবাচ্চাটা পিকুর সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত গেল। স্কুল থেকে পিকুদের বাড়ি বেশি দূরে নয়। স্কুলের ডান দিকের রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গেলেই বাঁ-হাতে ওদের বাড়ি।

পিকু রোজই বাচ্চাটাকে খেতে দেয়। সেও পিকুকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। দুজনের মধ্যে এভাবেই একটা সমঝোতা গড়ে ওঠে। পিকু ওর নাম রাখে ভিখু।

ছেলেবেলা থেকেই পিকুর ইচ্ছে ছিল একটা কুকুর পোষে। ভিখুকে পেয়ে ওর খুব ইচ্ছে হয় ওকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখে। আবার ভয়ও হয়, রাস্তার কুকুর। কী জানি মা রাজী হবে কিনা!

একদিন পিকু তার মায়ের কাছে প্রস্তাবটা করেই বসলো।

মা তো শুনে যেন হায় হায় করে উঠলো, ওমা! রাস্তার কুকুর। ওকে আবার বাড়িতে পুষবি কি!

পিকু বলে, ও রাস্তায় আছে বলে রাস্তার কুকুর। বাড়িতে থাকলেই বাড়ির কুকুর হয়ে যাবে। আমি ওকে খেতে দিই। ও তো খায়। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

চড়া গলায় মা বললে, আমি তোকে লুচি করে দিই। তুই ওকে খাওয়াস। এভাবে পয়সা নষ্ট করিস। এই আমি বারণ করে দিলাম–খবরদার আর কোনোদিন কুকুরকে লুচি খাওয়াবি না।

পিকু বোঝে মাকে বলে কোনো লাভ হবে না। ভিখুকে বাড়িতে রাখবে না। তাই সে হাল ছেড়ে দেয়। তবে প্রতিদিন তার টিফিন থেকে ভিখুকে খাবার দিতে ভোলে না।

এমনি করেই দিন যায়। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে হঠাৎ চারদিক কালো করে ঝড় উঠলো। পিকু দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি ঢোকে। ভিখুও আসে। পিকু বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল দাপটে বৃষ্টি নেমে আসে। এই বৃষ্টির মধ্যে ভিখুকে ছেড়ে দিতে পিকুর মন চায় না। সে হাত নেড়ে ভিখুকে বাড়ির ভেতরে ডাকে।

পিকুর মা বেরিয়ে আসে, কিরে পিকু! একদম ভিজে গোছস যে! যা এখুনি জামা প্যান্ট ছেড়ে আয়। ঠান্ডা লাগবে।

তারপর ভিখুর দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে ওঠে, ওমা! এই কুকুরটাকে কে বাড়িতে ঢোকাল গো?

পিকু বলে, দেখছো না মা, কি বৃষ্টি! এই বৃষ্টিতে ওকে আমি যেতে দেবো না।

–কিন্তু ও থাকবে কোথায়? জানিস, কুকুরের কত রকমের রোগ থাকে!

–বেশ তো ওকে কয়লার ঘরেই থাকতে দাও না। পিকু গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

এমন সময় পিকুর পিসী রাণু ওপর থেকে নেমে আসে। রাণু ক্লাস টুয়েলভে পড়ে। সব দেখেশুনে সে পিকুকেই সমর্থন করে, বৌদি কুকুরটাকে থাকতেই দাও। যা বৃষ্টি নেমেছে।

পিকু ভিখুকে কয়লার ঘরে রেখে দিয়ে জামা ছাড়তে যায়।

কিন্তু বৃষ্টি থামলেও ভিখু আর ওখান থেকে নড়তে চায় না।

অফিস থেকে ফিরে সব শুনে পিকুর বাবা বললেন, কুকুরকে লাই দিলে মাথায় উঠে যায়। তিনি চটি দিয়ে ভিখুর পিঠে দু'চারবার চাপড় মেরে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভিখু কিছুতেই গেল না। উল্টে সে আবার বাবার পা চাটতে লাগলো। ভাবখানা এমন যে– তোমাদের বাড়িতে আমায় একটু আশ্রয় দাও। আমার আর থাকার জায়গা নেই।

শেষে পিকুর মা-ই বললে, থাক ছেড়ে দাও। আর মেরো না। দেখি কি করে। খাবারদাবারে মুখ দিলে বাড়ি থেকে দূর করে দেবো।

ভিখু কথাটা কতদূর বুঝেছিল কে জানে! তবে সে ওদের বাড়িতে খাবার ঘরে ঢুকে কোনোদিন খাবারে মুখ

দেয় নি।

বিকেলে শংকুর মা এসে পিকুদের বাসন মাজে। পিকুর মা খাওয়ার পর এঁটো বাসনগুলো উঠোনে রেখে আসে। তাতেই যা এঁটোকাঁটা ভাত তরকারি পড়ে থাকে–তাই খেয়েই ভিখু সন্তুষ্ট। পিকু অবশ্য মাঝে মধ্যে লুকিয়ে চুরিয়ে ভালোমন্দ খাবার ভিখুকে খাওয়াতে ভোলে না।

যাই হোক এমনি করেই পিকুদের বাড়িতে ভিখুর একটা আশ্রয় জুটে গেল। ভিখুর থাকা নিয়ে এখন আর এ-বাড়িতে কেউই বিশেষ একটা মাথা ঘামায় না। তবে বাড়িতে ঢোকা বা বেরোবার পথে সিঁড়িতে ভিখুকে দেখলে বাবা হ্যাট্ হ্যাট্ করে ওকে তাড়ান। আর পিকুর ঠাকুমা ভিখুর দিকে চোখ পড়লেই ইষ্টনাম জপে নেন। এমনি করেই মাস দুয়েক কেটে গেল। ভিখু এখন বেশ বড়সড় হয়েছে। তার বুদ্ধিসুদ্ধিও ভালো। পিকু একবার যা বলে–ঠিক বুঝে নেয়।

সেবার পিকুদের বাড়িতে ঠাকুমার গুরুদেব বেড়াতে এলেন। আর তখনই সেই অঘটনটা ঘটে গেল।

গুরুদেব আসার পরের দিন রাতে হঠাৎ গুরুদেবের প্রাণপণ চিৎকারে সকলের ঘুম ভেঙে গেল। চিৎকারটা আসছে একতলা থেকে। দুদ্দাড় করে সবাই নিচে নেমে এলো। মা বিছানা থেকে উঠে পড়াতে পিকুর ঘুম ভেঙে যায়। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সেও মায়ের আঁচল ধরে নিচে নেমে আসে।

সবাই দেখে, ভিখু গুরুদেবের একটা পা কামড়ে ধরে আছে।

ওদের দেখে গুরুদেব কাতর স্বরে বললেন, রাতে কলতলায় যাবার জন্যে নিচে নেমেছি আর কুকুরটা আমার পা কামড়ে ধরেছে।

ঠাকুমা হায় হায় করে উঠলেন, ওমা আমার একি সব্বোনাশ হলো গো!

পিকুর বাবার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। কাঠ কয়লা ভাঙা শাবলটা তুলে নিয়ে ভিখুর পিঠে তিনি এক ঘা বসিয়ে দিলেন। নিশুতি রাত বিদীর্ণ করে ভিখুর করুণ আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে, ওউয়াঁ-ও-উ-য়াঁ। ওর চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসে। পিকুর বাবাকে যেন কিছু বলতে চায়। দু'বার কেঁপে উঠেই ভিখুর দেহটা তারপর স্থির হয়ে যায়।

ঘটনাটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায়। পিকু ছুটে আসে ভিখুর মৃতদেহের কাছে, ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে। পিকু দেখে, ভিখুর জন্যে কেউ কাঁদছে না। পিসীও না। সবাই তখন গুরুদেবের পায়ে মলম লাগাতে ব্যস্ত।

গুরুদেব বলছেন, আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকবো না। কি রাক্ষুসে কুকুর রে বাবা! দুর্গা দুর্গা। আমার এতদিনের সাধনা সব অশুদ্ধ করে দিলো!

পিকুর মা, ঠাকুমা হাতজোড় করে গুরুদেবকে থাকার জন্যে অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু কোন লাভ হলো না। উনি চলে গেলেন।

এই ঘটনা নিয়ে বাকি রাতে আর কেউ ঘুমতে পারলো না। পিকুর মনে অনেকটা অভিমান জমাট বাঁধে। কারোর সঙ্গে সে কথা বলে না। ভোর রাতে ধাঙড় আসতে তাকে দিয়ে ভিখুর মৃতদেহটা ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হলো।

সকালে জামাকাপড় বার করতে গিয়ে মা দেখলো, আলমারির পাল্লা খোলা। ভেতরে টানা থেকে সব গহনা উধাও। মা তো হা-হুতাশ করে হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলো। বাবা পুলিশে খবর দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দারোগা মিঃ মৈত্র এলেন। বাড়ির সবাইকে তিনি নানা প্রশ্ন করলেন। গুরুদেবের কথা শুনে মিঃ মৈত্র বললেন, গুরুদেবের একটা ছবি দেখাতে পারেন?

ঠাকুমার কাছে গুরুদেবের একটা ছবি আছে। রোজ সকালে তিনি ওতে ফুল দিয়ে পুজো করেন।

ছবিটা মিঃ মৈত্রকে দেখাতেই উনি বললেন, আরে এইতো–কাল্লু দত্ত। ভীষণ ধূর্ত। এ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম নিয়ে গুরুদেব সেজে শিষ্যদের বাড়ি যায়। তারপর সুযোগ পেলে শিষ্যের টাকাকড়ি গহনাগাঁটি নিয়ে কেটে পড়ে। সুযোগ পেয়ে কাল রাতে সে আপনাদের গহনা নিয়ে পালিয়েছে। এ ব্যাটা দুচারবার জেলও খেটেছে। যাই হোক, আমি ওকে ধরার চেষ্টা করছি। মিঃ মৈত্র আরও কিছু তথ্য জেনে নিয়ে বিদায় নিলেন।

বাড়িতে কারোর মুখে কোনো কথা নেই। ভিখু যে কেন গুরুদেবের পা কামড়ে ধরেছিলো কারোর আর বুঝতে বাকি থাকে না। দু'বেলা দুটো এঁটোকাঁটা খেয়ে তার ঋণ সে শোধ করে গেল জীবন দিয়ে। সবার চোখ দিয়েই দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। পিকু বুঝতে পারে সবাই ভিখুর জন্যে কাঁদছে। পিকুর চোখ দিয়ে কিন্তু জল পড়ে না। তার মনে যে প্রচন্ড অভিমান জমা হয়েছিলো–সেটা যেন আক্রোশ হয়ে ফেটে বেরিয়ে এসে বলতে চায়, বেশ হয়েছে, যেমন কাজ করেছো! কাঁদো কাঁদো কাঁদো, তোমরা কাঁদো, আরও আরও আরও.....

ছবি : দিলীপ দাশ

আবিষ্কারের গল্প

গঙ্গেশ ঘোষ, মদন মুখোপাধ্যায়

চোখ বুজে আসছে যেন ঘুমে। কিন্তু ঠিক ঘুম নয়; চোখের পাতা দুটো বুজে ঘুম ঘুম মুখ করে চিন্তার গভীরে ডুবে গেছে এক কিশোর।

মাথায় এক গুচ্ছ সোনালী চুল। চুলগুলো এলো-মেলো। অগোছালো ভাবে নেমে এসেছে মুখের ওপরে। তারই ভেতরে চোখে এক বিরাট প্রশ্ন।

সামনে একটা কেটলিতে জল ফুটছে। এতক্ষণ চোখ মেলে সেদিকেই তাকিয়েছিল এই কিশোর। দেখছিল জল গরম হয়ে কেটলির চারপাশ দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। ধোঁয়াগুলো যত বেরিয়ে আসছে কেটলির ঢাকনাটা ততই লাফালাফি করছে। কী আশ্চর্য! কে ওই ঢাকনাটাকে অমন করে নাড়ছে। কেটলির ভেতরে কোন অদৃশ্য শক্তি আছে যে ঢাকনাটাকে নাড়তেই ঢাকনাটা এমন খটখট আওয়াজ করবে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ভাবনা। আর ভাবতে ভাবতেই এমনি চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল এই কিশোর।

কিন্তু কে এই কিশোর ? কী তার নাম ! নামটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরতে পেরেছো তোমরা। হ্যাঁ–ইনিই সেই কিশোর, নাম জেমস ওয়াট। বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করে যিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে রইলেন। আর তার শুরু কিন্তু ওই ঘটনা থেকে। সকালে ঘুম ভাঙার পর ব্রেকফাস্ট সেরে মার সঙ্গে সঙ্গে এসে উঠল ওই ঘরে। মা বললেন তাকে সাহিত্য পড়তে। কিন্তু ছেলে বসে গেল জ্যামিতির ছক কাটতে। এই সময়ই ওই ঘটনার শুরু। ফুটন্ত জলের ওপরে কেটলির ঢাকনাটা বারবার ওঠানামা করতেই তার মনে প্রশ্ন জাগল : কেন এমন হলো!

এই 'কেন'-র উত্তর খুঁজতে গিয়েই কিন্তু সময় চলে গেল অনেকদিন। ততদিনে অসংখ্য জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। ঘুরেছেন গ্রীনক থেকে লন্ডনের আনাচে-কানাচে। সঙ্গে ওই এক প্রশ্ন : কেন এমন হলো ? কি ওই শক্তি যা কেটলির ঢাকনাকে অমনভাবে সজোরে ধাক্কা দেয়। কোন সেই শক্তি যে ঢাকনাটাকে নিয়ে এমনভাবে ছেলেখেলা করে।

প্রশ্নটা মাথার মধ্যে ঘুরছিল তবে উত্তরটা পেলেন না

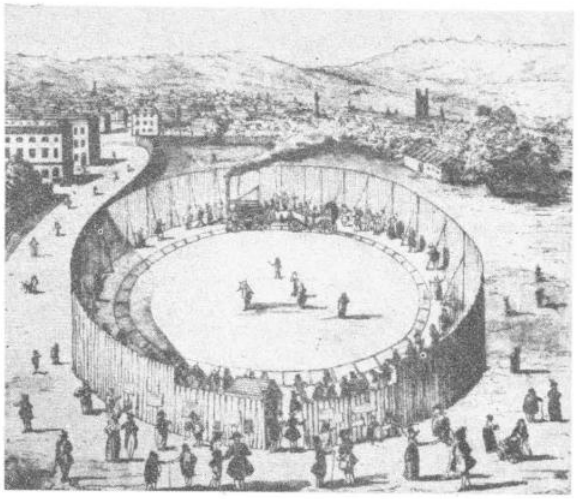

লন্ডনের আউস্টন স্কোয়ারের পার্কে ইঞ্জিন-সার্কাস বসেছে

চট করে। ঘুরতে ঘুরতে ততদিনে ওয়াট এসে উঠেছেন এক কারখানায়। সেখানেই কাজ নিয়েছেন তিনি।

কারখানাটা ছিল নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরি হওয়ার জায়গা। দেখে ওয়াটের খুব ভালো লেগে গেল। মনে মনে যেন এরকমই একটা কাজ খুঁজছিলেন তিনি।

প্রথম দিন থেকেই তাই লেগে গেলেন তিনি। মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন কাজের মধ্যে। শেষে কাজের ফাঁকেই একদিন তাঁর চোখে পড়ল হীরোর স্টিম ঘূর্ণি। পুরাণে যাকে বলত 'ম্যাজিক কল'। ম্যাজিক কলটা বারবার দেখলেন তিনি। ভালো করে পরীক্ষা করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই তার উত্তরটা পেয়ে গেলেন। মন চাইল তখন একটা কারখানা তৈরি করতে। জেমস ভাবলেন, যেভাবেই হোক তাঁর নিজের একটা কারখানা তৈরি করতেই হবে। নিজের কারখানা থাকলে নিজেই তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারবেন যন্ত্রপাতি নিয়ে।

অবশেষে সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটল। অনেক চেষ্টা আর উদ্যোগের পর গ্লাসগোতে একটা জায়গা পেলেন জেমস। সেখানেই তাঁর কারখানা তৈরি হলো। আলাপ হলো এখানেই একদিন ডঃ জোসেফ ব্লাক-এর সঙ্গে। ব্লাক ছিলেন একজন বিজ্ঞানের গবেষক। কথায় কথায় তিনিই একদিন জেমসকে বুঝিয়ে দিলেন জেমসের ছেলেবেলার সেই ঘটনাটার ব্যাখ্যা। বললেন, জল গরম হয়ে যাওয়ার পর কেন কেটলির ঢাকনাটা অমন নাচানাচি করছিল। বুঝিয়ে দিলেন, তাপ কত রকম এবং লীন তাপের কী শক্তি!

কারখানা তো তৈরি হলো, কিন্তু কী নাম দেওয়া যায়!

সমস্যা যখন জেমসকে ভাবিয়ে তুলছে ঠিক তখনই গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসর এসে হাজির হলেন তাঁর কাছে। সঙ্গে নিউকমন মডেলের ইঞ্জিন একটা।

প্রফেসর বললেন, দেখ তো ওয়াট–এটাকে আর কোনো কায়দায় চালানো যায় কিনা!

–কেন কী হয়েছে? জেমস তাকালেন প্রফেসরের দিকে।

প্রফেসর বললেন, হয়েছে মানে অনেকবারই তো সারালাম। কিন্তু কিছুতেই আর চলছে না।

জেমস টেনে নিলেন ইঞ্জিনটা। ভালো করে দেখলেন। আর দেখেই প্রচন্ড চমকে উঠলেন। চোখ দুটো তাঁর কপালে উঠে যায় আর কি! আরে, এই তো সেই ইঞ্জিন যেখানে বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগানো যায়। ব্যস! যেমন ভাবা তেমনি কাজ! সঙ্গে সঙ্গে জেমস বসে গেলেন ইঞ্জিন খুলতে। তাঁর মাথায় তখন একটাই চিন্তা। একটা কথাই ভাবছেন তখন। ভাবছেন, জল ফোটালে বাষ্প যদি কেটলির ঢাকনাকে ফেলে দেয়, তবে ইঞ্জিনের ভেতরে জল ফুটিয়ে বাষ্প করে সেই শক্তি দিয়ে নিশ্চয়ই ইঞ্জিনও চালানো যেতে পারে।

পরের দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল কাজ। নিউকমন মডেলের সঙ্গে জেমস জুড়ে দিলেন আরও দুটো চেম্বার, যাতে স্টিমের শক্তি আরও বেড়ে যায়। হলোও তাই। ইঞ্জিনের গতি গেল বেড়ে।

গতি তো বাড়ল, কিন্তু এখানেই থেমে থাকতে চাইলেন না জেমস। চেষ্টা চালাতে লাগলেন, গতি কি করে আরও বাড়ানো যায়। ইঞ্জিনকে কি করে আরও আধুনিক করা যায়। আরও অন্যরকম করে কি করে সাজানো যায় ইঞ্জিনকে? ফলে এই চিন্তায় রাতদিনই ইঞ্জিন আর ইঞ্জিনের যন্ত্রপাতির মধ্যে পড়ে রইলেন তিনি।

কখনো পোড়াতে লাগলেন চর্বি। কখনো কাগজ। কখনো বা অন্য কিছু। দেখতে লাগলেন, কোন শক্তি দিয়ে জল ফোটালে বাষ্প খুব শক্তিশালী হয়। ভেবে ভেবে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষাই করলেন। এভাবেই কেটে গেল সাত সাতটি বছর। এই সাত বছরে যে পরীক্ষার ফল কিছুই পাওয়া যায়নি তা নয়। পেয়েছেন কিছু কিছু। যেমন এই পরীক্ষার ফলেই বুঝতে পারলেন, তার হাতে এখন বাষ্পকে ধরে রাখার ক্ষমতা হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু সে ক্ষমতাকে ব্যবহার করা যায় কোন ইঞ্জিনে? জেমস ভাবতে লাগলেন।

একদিন খবর পাওয়া গেল। জানা গেল, আইরসায়ার গ্রামে মুড্রকের একটা ইঞ্জিন তৈরি হয়েছে। জেমসের দৃষ্টি ঘুরে গেল সেদিকে। বয়স ততদিনে পঁয়ত্রিশের কোঠা ছেড়ে ছত্রিশে এসে পা রেখেছে।

১৭৭২ সাল। গোটা ইংলন্ড জুড়ে তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি। নেপোলিয়ন এগিয়ে চলেছেন। এদিকে যোগান চাই কয়লার। কিন্তু এত কয়লার যোগান দেবে কে! তাছাড়া জল চাই। চাই সৈন্য ও ঘোড়ার জন্য। ঘোড়াই বা অত কোথায়! অসংখ্য ঘোড়া যে লাগবে যুদ্ধের কাজে। গোটা ইংলন্ড জুড়ে একটা ত্রাসের সৃষ্টি হলো।

কোলিয়ারিতে মালিকরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। এত কয়লা তুলবে কি করে রাতারাতি। যোগান দেবে কি করে? ঘোড়ায় টেনে কয়লা গাড়িতে করে নিয়ে যেত, কিন্তু ঘোড়ার ওপর ট্যাক্স বসল। এখন উপায়? কে টেনে নেবে অত কয়লা! কাজেই বাধ্য হয়েই কোলিয়ারির মালিকরা বসাতে শুরু করল ইঞ্জিন। বিরাট উৎসাহে জেমস কাজে লেগে গেলেন। সঙ্গী হলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ম্যাথুই বালটন।

কিন্তু বালটন এতে খুশি হতে পারেননি। না হওয়ারই কথা! কেননা এই ইঞ্জিনগুলো দিয়ে শুধু দড়ি টানা ছাড়া আর কি-ই বা করার আছে। তাই নিঃশব্দে সবার আড়ালে একটা নতুন ফন্দি বার করলেন তিনি। ইঞ্জিনে লাগালেন চাকা।

একদিন ভোররাতে চুপিচুপি ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করছিলেন বালটন। হাত ফস্কে ইঞ্জিন গেল ছুটে। সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়োতে শুরু করল। ছুটল রাস্তা দিয়ে। সামনেই ছিল এক চার্চ। পাদ্রী তখন বাইরে কি করছিলেন। হঠাৎ ওই ইঞ্জিন দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, কে আছো বাঁচাও–বাঁচাও–শনি আমায় তাড়া করেছে–

শনি! কোথায় শনি! চিৎকার শুনে দু'চারজন ছুটে গেল রাস্তায়। ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখল। দেখে তাদেরও চমকে ওঠার পালা। ব্যস! খবর আর চাপা রইল না। বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে।

খবর পেয়ে মুড্রক এই ইঞ্জিনের গতিকে বাড়াবার জন্য, ইঞ্জিনকে আরও ভালো করে চালাবার জন্য পরামর্শ দিলেন কয়লার ব্যবহারের। ঠিক সে সময়ে রেডরুথ গ্রামে উসখুস করছিলেন ক্যাপ্টেন ডিক। গ্রামবাসীদের কাছে যিনি রিচার্ড এডিফিক নামেই পরিচিত। যাই হোক আর সহ্য করতে পারলেন না ক্যাপ্টেন ডিক। তড়িঘড়ি নেমে পড়লেন কাজে। কোলিয়ারি ইঞ্জিনীয়ারের কাজটা দিলেন ছেড়ে।

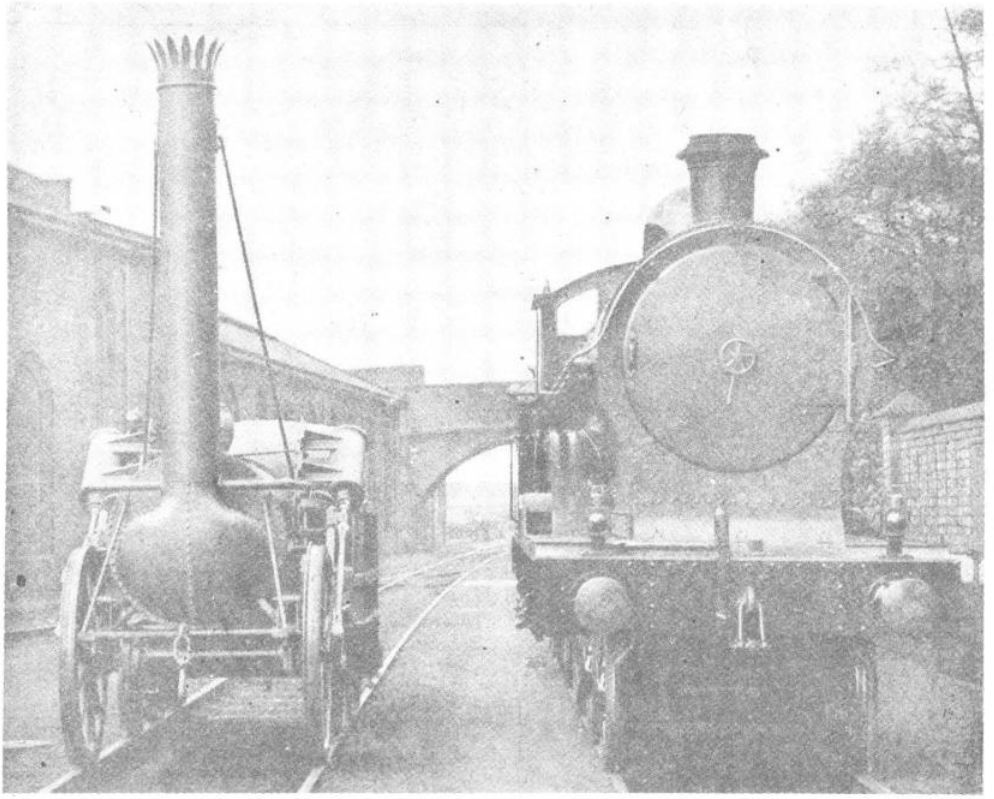

এ যুগের ইঞ্জিনের পাশে স্টিফেনসনের রকেট

১৮০১ সালে প্রথম রেলগাড়ি চলল প্রকাশ্যে। অনেক চিন্তা ভাবনার পর এর পেছনে লাগানো হলো একটি কোচ। যেমন থাকে ঘোড়ার গাড়িতে। এবার একটা নাম দেওয়া দরকার এই ইঞ্জিন গাড়ির। অনেক ভাবনাচিন্তার শেষে ঠিক হলো নাম–'ঝুকঝুক ভূত'। এডিফিকের বা ক্যাপ্টেন ডিকের ভাষায় 'পুটিং ডেভিল'।

একদিন বিকেলে খাওয়াদাওয়ার পর এই পুটিং ডেভিলকে নিয়ে বেরোলেন ক্যাপ্টেন ডিক। সঙ্গে তাঁর বন্ধু-বান্ধব। বেশ যাচ্ছিল এই স্টিম গাড়ি। অবশ্য রাস্তায় যে দেখে সেই ভয়ে অস্থির। পালিয়ে যেতে লাগল। শুধু ভয় এই বুঝি চাপা দেয়। কিন্তু না–কাউকে চাপা না দিয়ে দিব্যি চলতে চলতে গাড়িটা এসে দাঁড়াল এক রেস্তোরাঁর সামনে। গাড়ি থেকে নেমে দল বেঁধে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লেন ক্যাপ্টেন ডিক। শুরু হলো খাওয়া-দাওয়া।

খেতে খেতেই গল্পগুজবে মেতে উঠেছেন সবাই। হঠাৎ একটা পোড়া গন্ধ ভেসে এল। কি ব্যাপার! কোথা থেকে গন্ধটা আসছে! তবে কি ইঞ্জিনের কিছু হলো! ছুটে বেরিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন ডিক। হায়! এ যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ইঞ্জিনের জল শুকিয়ে একদম বাষ্প। এখন কী করবেন!

কী আর করবেন? আবার নতুন উদ্যমে তৈরি করলেন আর একটি মডেল। ১৮০৩ সালে। ছোটালেন সেটাকে কর্ণওয়েল থেকে ইংল্যান্ড। কিন্তু ইতিহাস আবার ব্যঙ্গ করল। খানিকটা চলেই ইঞ্জিনের আবার দফাগয়া।

এবারে ভাবলেন ডিক। ঠিক করলেন, না এবার আর মাটিতে নয়। ইঞ্জিনের জন্য আলাদা রাস্তা চাই। এই রাস্তাই হলো রেল লাইন। রেল লাইনের পরিকল্পনা তো হলো, কিন্তু লাইন পাতার সুযোগ দেবে কে?

পৃথিবীতে মন্দ লোকের সংখ্যা বেশি হলেও ভাল লোক যে একেবারে নেই তা বলা চলে না। তার প্রমাণ সাউথ ওয়েলস্-এর 'পেন-ই-দারাণ'-এ লোহার খনির মালিক। এক কথায় ছেড়ে দিলেন তাঁর খনি থেকে কারখানায় আসার ঘোড়া টানা ট্রামের লাইন।

সে এক লোমহর্ষক ব্যাপার–ইঞ্জিন চলছে এডিফিকের। পেছনে বাঁধা পাঁচ পাঁচটা বগি। তাতে দশ টন লোহা ঠাসা আর তার সাথে সত্তর জন কুলি মজুর। আর কী জোরে যাচ্ছে! ঘণ্টায় পাঁচ মাইল, যা তখনকার দিনে

কেউ ভাবতেই পারত না।

ব্যস! এডিফিক হাতে চাঁদ পেয়ে গেছেন। কিন্তু পয়সাটার ধাক্কাও তো সামলাতে হবে। তাই লন্ডনের আউস্টন স্কোয়ারের পার্কে একটা "ইঞ্জিন সার্কাস" বসালেন। সার্কাসটা বেশ মজার–একটা রেলগাড়ি ঘুরছে একটা গোল করে বসানো লাইনে। আর লোকজন ছুটছে তার পেছন পেছন। অনেকটা "কে আমায় ধরতে পারে" গোছের ব্যাপার–এডিফিক টিকিটও ছাপালেন–"Catch me who can" লিখে। ভিড়ও হলো বেশ....

হায় কপাল। প্রথম শোতেই ইঞ্জিনের চাকা গেল ভেঙে। এ ধাক্কা ভেঙে দিল এডিফিককে। দেশ ছেড়ে চলে গেলেন পেরু। সেখান থেকে কলম্বিয়া।

কিন্তু আবিষ্কার কারোর ভরসায় বসে থাকে না। ক্যাপ্টেন ডিকের চোখের সামনেই জর্জ বেড়ে উঠতে থাকে। জর্জের বাবার কাজ ছিল কয়লাখনির পাম্পমেসিন চালানো। জর্জ তাঁরই সাহায্যে লেগে থাকে। খারাপ হলে সংগে সংগে সারিয়ে দেয় মেসিন। এইভাবেই শুরু করল সে তার জীবন। মাত্র চোদ্দ বছর বয়েসেই বাবার অবর্তমানে চালাত মেসিন। এইভাবে সে খ্যাত হলো 'ইঞ্জিন ডাক্তার' নামে। এত কাজের পর কি করে পড়বে সে! শেষে আঠেরো বছর বয়েসে "প্রতি পাঠে একপাই" নিয়মের এক নাইট স্কুলে ঢুকে ১৯ বছরে তার নাম সই করতে শিখলো।

এই সময় বরাত খুলে গেল জর্জের। লর্ড র‍্যাভেন্সওয়ার্থ নামে এক খনি মালিকের চোখে পড়ে গেল জর্জ স্টিফেনসন। জর্জের বুদ্ধিটা তিনি নিলেন। তুমি কি এই ঘোড়াটানা ট্রাম লাইনগুলোতে চালাতে পারবে ইঞ্জিন? স্টিফেনসনকে বললেন তিনি।

–হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি তো এই কথাটাই বলব ভাবছি। এতে যে শুধু সময় বাঁচবে তাই নয়–উৎপাদন বাড়বে, কমবে খরচ অনেক বেশি।

ফল ফলল হাতে হাতে–১৮১৪ সালে রেল লাইনে গড়ালো ব্লুসার (Blucer)। প্রমাণ সাইজের একটা ইঞ্জিন সংগে টেনে নিয়ে চলেছে আটটা বগি ভর্তি ত্রিশ টন কয়লা। ঘণ্টায় চলেছে চার মাইল করে।

অর্ডার আসতে লাগলো আরো ইঞ্জিন বানানোর। সংগী হলো তাঁর ছেলে রবার্ট। হ্যাঁ ছেলে বটে এই রবার্ট–যেমন ছিল পড়াশোনায় তেমন ভাল মাথা ইঞ্জিনে। নিত্য নতুন রূপ দিচ্ছে সে ইঞ্জিনে। একটার পিস্টন খাড়া তো অন্যটায় শোয়ানো, কোনোটার বয়লারের স্টিম পাইপে করে আসছে তো কোনোটায় স্টিম সরাসরি।

কিন্তু ভাল জিনিসের বাধা অনেক! সাধারণ লোক তা মেনে নিতে পারে না পাদ্রীদের উসকানিতে! নানা কথা শোনা যেতে লাগল দিকে দিকে, এতে নাকি দেবতারা বিরূপ হবেন! মানুষ নাকি আর কাজ করবে না! ঘোড়া কারবারীরা মদতও দিলেন প্রচুর। এ সত্ত্বেও জর্জ স্টিফেনসন তাঁর ধারণায় অটুট। তিনি ঘোষণা করলেন, দেশ যদি রেল তৈরি করে, তবে রেল দেশ তৈরি করে যাবে।

বাবার এই বাণীকে বহন করে চলল রবার্ট। চালিয়ে গেল তার গবেষণা। আর তার সাথে পার্লামেন্টে সুপারিশ ও বহু বাগবিতন্ডার পর কাগজে বেরোল সেই ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতা–যা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে পৃথিবীর ইতিহাসে চিরকাল।

প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতা–পুরস্কার! পাঁচশ পাউন্ড। শর্ত! সে অনেকগুলো–তবে সব থেকে মজার শর্ত হলো গাড়ির খরচা পাঁচশ পাউন্ডের যেন বেশি না হয়।

প্রতিযোগিতার নাম শুনে অনেকেই হাজির হলো। নামও তাদের নানা রকম, কোনোটা নোভালটি, কোনোটা সান্‌সপেরিল, পারসিভারেন্স ইত্যাদি। আর এদের সাথে পাল্লা দিতে হাজির রবার্টের "রকেট"। ময়দানে যে যার মত লাইন পেতেছে। এক এক করে সব কটা ইঞ্জিন হাজির কিন্তু রকেট আর আসে না–হঠাৎ হৈ হৈ করে ওঠে লোকজন–দেখে একটা ঘোড়ার গাড়ির পেছনের বগিতে করে আসছে রবার্টের ইঞ্জিন "রকেট"।

যা হোক্ প্রতিযোগিতা শুরু হলো, রকেট ছুটলো সাড়ে তেরো মাইল গতিবেগে। উঃ নোভালটিও তো কম যায় না–কিন্তু পরের দিন বিগড়ে গেলো। সান্‌সপেরিলও তথৈবচ–ওর নাকি বয়লারে চিড় ধরেছে। আর পারসিভারেন্স ছ মাইলের বেশি গতিই পেল না।

জিত হলো রকেটের। পরের দিনের দৌড়ে তেরো টন মাল নিয়ে ছুটল ১৫ মাইল গতিতে। আর ফাঁকা গাড়ি, সে তো কলকাতার এখনকার বাসের থেকেও জোরে, প্রায় ৩৫ মাইল গতি। কিন্তু দর্শকরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল–ভাবে বুঝি বাতাসের ধাক্কায় ড্রাইভার সাহেব দম ফেটে অক্কা গেছেন। কিন্তু মিস্টার ডিকসন যখন গাড়ি দাঁড় করিয়ে হাসতে হাসতে নেমে এলেন হৈ হৈ পড়ে গেল চারদিকে।

আর এই ইঞ্জিনই চলল ১৫ই সেপ্টেম্বর ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লিভারপুল ১৮৩০ সালে। পৃথিবীর গতির যুগ শুরু আর বসে থাকা নয়। জেমসের কল্পনা আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে।

ফিরে ফিরে দেখে লোকে...
সুপার রিন-এর চমকটিকে!
सुपर
रिन
सफ़ेदी की चमकार
RIN
সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক...
অন্য যে কোনো ডিটারজেণ্ট ট্যাবলেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
LINTAS RIN 93 2418 BG

হাতের কাজ হাতেনাতে

চন্ডী লাহিড়ী

স্যার, খুব ভাল লাগল আপনার বক্তৃতা। পরের চাকরির ওপর অনিশ্চিত ভরসা না রেখে কিছু হস্তশিল্প শিখে স্ব-নির্ভর হতে বলেছেন আপনি। দারুণ বলেছেন স্যার। আমরাও স্যার চাকরির জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। পাইনি। শেষ পর্যন্ত হাতের নানা রকম কাজ শিখে এখন দু-পয়সা রোজগার করছি।

গদাধরবাবু বক্তৃতা করেছেন অনেক কিন্তু এরকম নিষ্ঠাবান শ্রোতা পাননি। কর্মজীবন থেকে রিটায়ার করে এখন রোজই সভা-সমিতিতে ভাষণ দিয়ে বেড়ান। হাততালি প্রচুর পান কিন্তু তাঁর পরামর্শ মেনে জীবনে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে এমন কোনো মানুষকে তিনি দেখেন নি। সুতরাং গদাধরবাবু আবেগে আপ্লুত হলেন। গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছিলেন। সেটা থামিয়ে ভক্ত তরুণ ছেলেদুটিকে সস্নেহে বললেন–তোমরা যাবে কোথায়? যদি কলকাতায় যাও আমার গাড়িতে যেতে পারো। বিকেলে ইষ্টবেংগল-মহমেডানের খেলাটা দেখে বাড়ি ফিরবো।

ছেলে দুটিকে গাড়ির পিছনের সিটে বসিয়ে স্টার্ট দিলেন।

–আমরাও চৌরংগীতে যাবো–ঐ দিকেই আজ কাজ পড়েছে। ভালই হল, যেতে যেতে আপনার একটু উপদেশ শোনা যাবে স্যার।

গাড়ি দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়ে সিঁথি পেরিয়ে শ্যামবাজার এসে জ্যামে আটকালো। সেই ফাঁকে গদাধরবাবু আলাপ শুরু করলেন।

–হাতের কাজ শিখে স্বাধীনভাবে রোজগার করছো শুনে খুব আনন্দ পেলাম। বাংগালী ছেলেদের বড় দুর্নাম, তারা পরের গোলামি করতে ভালবাসে, স্বাধীন ব্যবসার কথা ভাবে না। আচার্য পি-সি রায় অনেক চেষ্টা করেছেন, বাংগালী ছেলেদের ব্যবসায় নামাতে। সব বৃথা! আমি তো সভা-সমিতিতে সুযোগ পেলেই হাতের কাজ শিখে ব্যবসায় নামতে পরামর্শ দিই । নো-ক্যাপিটাল, নো ইনভেস্টমেন্ট–ভগবানের দেওয়া দুটি হাত, আর ঘটে একটু বুদ্ধি।

–ঠিক বলেছেন স্যার। আমরাও কোনো ইনভেস্টমেন্ট করতে পারিনি। কেবল নিজেদের হাত দুটির উপর ভরসা রেখেছি। আর জানেন তো স্যার, বুদ্ধি থাকলে পরিশ্রম কম হয়। অথচ টাকা আসে।

শ্যামবাজারে গাড়ি ট্রাফিক জ্যামে আটকানো। ট্রাম, লরী, বাস, রিকশা সবাই লড়ে যাচ্ছে। পুলিস নেই। জ্যামে আটকে থাকতেই গাড়ির ইঞ্জিন বিগড়ে গেল। গদাধর চেষ্টা করলেন অনেক, গাড়ি নট্ নড়ন চড়ন। ছেলেদুটি নিজেরাই এগিয়ে এল। বনেট খুলে ইঞ্জিন পরীক্ষা করে ফিরে আসতে গাড়ি চলতে শুরু করল। তারপর একেবারে হাতিবাগানে এসে গাড়ি থামালেন। সিগারেট কিনতে হবে।

–এক মিনিট। যাবো আর আসবো। সত্যিই এক মিনিটেই সিগারেট কিনে গদাধর ফিরে এলেন।

গাড়ি এবার বেশ জোরে ছুটতে শুরু করল। বেশ কিছু পথ যাবার পর আবার জ্যামে আটকালো। বোঝা গেল এই যান-জট ছাড়তে অনেক সময় লাগবে। গদাধর ঠাট্টা করে বললেন–এসো একটু হস্তশিল্পের চর্চা করা যাক। দাবার ছক বের করলেন। দাবা খেলা–হাতের কাজ তো বটেই। বিনা ইনভেস্টমেন্টে রাজা উজীর বধ করা যায়।

আধ ঘন্টা খেলা চলার পর যান-জট ছাড়লো। গদাধর খেলা বন্ধ করে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। সাঁ সাঁ করে গাড়ি চালিয়ে একেবারে চলে এলেন মেট্রো সিনেমার সামনে। সেখানে ছেলে দুটি নেমে গেল। গদাধর চলে গেলেন ময়দানে খেলার মাঠে।

সন্ধ্যার একটু আগেই খেলা শেষ হল। গদাধর মনের আনন্দে শিস দিতে দিতে বের হলেন। বোধহয় তাঁর ফেভারিট টিম খেলায় জিতেছে। একটু দূর এগিয়েই তাঁর শিস থেমে গেল। কেল্লার কাছে ঐ বট গাছটার নিচে গাড়ি রেখেছিলেন। কিন্তু গাড়ি কই ? কাছাকাছি যতদূর নজর যায়–কোথাও তাঁর গাড়ি নেই। অথচ গাড়ি পার্ক করার সময় ভাল করে চাবি দিয়েছিলেন। দরজা জানালা লক করে ধাক্কা দিয়ে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে তবেই খেলা দেখতে গিয়েছিলেন।

মনের আনন্দ নিমেষে হারিয়ে গেল। পুলিসে খবর দিলে হয়। কিন্তু তাতে লাভ কি ! পকেটে হাত দিয়ে টাকা খুঁজতে গিয়ে দেখলেন মনিব্যাগটাও নেই। মেজাজ আরও খারাপ হল। কাঁদো কাঁদো মুখে ট্যাক্সি ধরলেন। বাড়ি পৌঁছে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দেবেন। এখন বাড়ির কাছে আসতে খেয়াল হল সদর দরজার চাবি মনিব্যাগে ছিল, সেটাও তো খোয়া গেছে। তালা ভাংগতে হবে।

বাড়ির দরজায় ট্যাক্সি থেকে নামলেন। অবাক কান্ড। তাঁর সদর দরজায় কোনো তালা নেই। দরজাটা খুব আলগাভাবে ভেজানো। ভিতরের ড্রইংরুমে আলো জ্বলছে। তা-হলে কি...নিশ্চয়ই চোর ঢুকেছে। যদি চোর তালা খুলে ভিতরে গিয়ে থাকে তবে সে কি এখনও ভিতরেই আছে। ভিতরে সব আলো জ্বলছে–কারা যেন বাইরের ঘরে বসে সিগারেট খাচ্ছে। লোক চলাচলের শব্দ। তাহলে চোর ভিতরেই আছে।

এ রকম অবস্থায় কি করা উচিত সেটা ঠিক করতে পারলেন না। "চোর" "চোর" বলে চেঁচাবেন ? চোর সেক্ষেত্রে পিস্তল হাতে ছুটে এসে তাঁকেই আগে গুলি করবে। এদিকে ট্যাক্সিওলা দুবার হর্ন দিয়েছে–অর্থাৎ ভাড়া মিটিয়ে দাও। ঘরের মধ্যে আলমারিতে টাকা আছে। যদি অবশ্য চোরে সে-টাকা ইতিমধ্যে হাতিয়ে না থাকে। ট্যাক্সিওলা আবার হর্ন দিল। বেশ জোরেই। তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে দুটি মানুষ বের হয়ে এল। গদাধরবাবু চোখ বন্ধ করলেন– সশস্ত্র চোর বুঝেছে মালিক ফিরেছে। এবার তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

–আপনি এসে গেছেন স্যার। ভিতরে যান। আমরা আপনার ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছি।

খুব চেনা কণ্ঠস্বর। গদাধরবাবু চোখ খুললেন। সেই দুই তরুণ যাদের দক্ষিণেশ্বর টু চৌরংগী লিফ্‌ট্ দিয়েছিলেন বিকেলে–তাঁর গুণমুগ্ধ সেই ভক্ত দুজন।

গদাধর হাসবেন না রাগ করবেন ঠিক করতে পারছেন না। ড্রইং রুমের ভিতরে গিয়ে সোফায় বসলেন।

সেটাও তো আমাদের হাতের কাজ।

–ভাববেন না স্যার। আপনার গাড়ি খোয়া যায়নি। হাতের কাজ কেমন শিখেছি সেটা দেখিয়ে দিলাম।

অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চার করে গদাধর প্রশ্ন করলেন –চাবি পেলে কোথায় ? আমি তো গাড়ি ভাল করে লক করে তবেই খেলা দেখতে গিয়েছিলাম।

–মনে পড়ছে স্যার। আপনার গাড়ির ইঞ্জিন বিগড়েছিল ? আমরাই তো ইঞ্জিন সারালাম। তখনই চাবিটা দেখে নিয়েছিলাম। ডুপ্লিকেট করতে সময় লাগে না। সেটা তো আমাদের হাতের কাজ। আপনি গাড়িতে বসে দাবা খেলতে বসলেন একজনের সংগে। আমাদের আর একজন আপনার পিছনে বসে চাল বলে দিতে লাগল। আসলে তখনই মানিব্যাগটা আপনার পকেট থেকে সরানো হল। সেটাও তো আমাদের হাতের কাজ। আপনিই তো হাতের কাজ শিখে দুপয়সা রোজগার করতে বলেছিলেন।

গদাধর হতবাক। তাঁর পরামর্শ শুনে তাঁরই উপর দিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছে যারা তাদের প্রতি রুষ্ট হওয়া অশোভন।

–আপনার গাড়ি আপনার গ্যারেজে রেখে দিয়েছি স্যার। একটা নাটবল্টুও খোয়া যায়নি স্যার। আশীর্বাদ করুন স্যার, টা-টা।

ছবি-চন্ডী

নতুন ধাঁধা

[১] শিরহীন রামপুত্র
করিল আহ্বান
বল তো লুকিয়ে আছে
কিবা তার নাম।

বিমল গোস্বামী/রাণীগঞ্জ, বর্ধমান

[২] নলের ভিতর জল ভরে
দেখ মেকী পরখ করে।

অলোককুমার চট্টরাজ/ দুর্গাপুর-১২

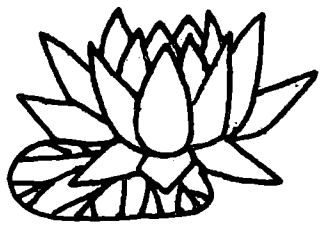

ভদ্র সংখ্যার ধাঁধার উত্তরঃ–
[১] কাগজ [২] বাতাস
[৩] নহবত [৪] গোপন

[৩] বনের সম্মুখে দেখ
লেজকাটা পশু,
রামায়ণ ঘাঁটলেই
সমাধান আশু।

তড়িৎ পাল/ইছাপুর, নবাবগঞ্জ

[৪] পাখা নেই উড়ে যায়
মুখ নেই তবু ডাকে
বুক চিরে আলো ছোটে
এ কোন জন হাঁকে।

অজিতকুমার ভট্টাচার্য/ভাটপাড়া

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম ঃ

।।কলকাতা।।

অপর্ণা রায়/রায়পাড়া হাউজিং এস্টেট; কৃষ্ণা, পূর্ণিমা, শুক্লা ও অনামিকা/বেলঘরিয়া সি. পি. এস্টেট; সজল, শিল্পী, সায়ন্তী মজুমদার, বিনয়, রত্না ও টুম্পা ঘোষ/এন.জি. বসাক রোড, দমদম; সুমন ও সুদীপ ভট্টাচার্য/বনমালী চ্যাটার্জী স্ট্রিট; সংগীতা, জয়ন্ত, অভিরূপ, সঞ্জীব ও জয়দীপ/বিবেকানন্দ রোড; বাপী, টপি, রাণা ও ভিক্টর/মহেন্দ্র রায় লেন; মৌসুমী ও মহুয়া গোস্বামী/বাগমারী লেন; তপনকুমার চক্রবর্তী/বড়িশা; অরুণিমা ও অভিষেক চ্যাটার্জী/বেণী কলোনী, সিঁথি; সুলতা মন্ডল/গোপীমোহন দত্ত লেন; ডালিয়া, পাপিয়া, মোম ও ইন্দ্রনীল ভৌমিক/শহীদনগর; টুম, কুটি, বুবুন, শিবরাম ও টিঙ্কু/সেলিমপুর লেন; সুপ্রিয় ও শুভেন্দু মুখার্জী/মহেশ দত্ত লেন; সাহানা রায়/সল্ট লেক; কিংশুক মজুমদার ও জয়ন্ত বিশ্বাস/রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট; কাজল, সৌমদীপ্ত, সমীর, মমতা, চয়নিকা, গোরা, মুনিয়া ও শ্রাবণী/অটলবিহারী লেন; দীপাঞ্জলি, পার্থ, সোমা, গৌতম ও শুভংকর/পটলডাংগা স্ট্রিট; রুদ্র মুখোপাধ্যায়/ নেতাজী নগর; মুনিয়া, মিত্রা, মিঠুন, মধুমিতা ও মিতালী/বীরপাড়া লেন; মৈত্রেয়ী সেন/কসবা; পারমিতা ও গৌতম ঘোষ/কে.পি. মুখার্জি রোড; শর্মিলা ও সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়/আর. এন. ঠাকুর রোড; দীপাংশু ঘোষ ও রমলা মল্লিক/রাসবিহারী এভিনিউ; কমল, মীরা, মিম্মি ও মিতিল/নিমতলা লেন; স্মিতা ভদ্র/যোগেশ মিত্র রোড; বাসুদেব, চন্দনা, ইলোরা ও ইন্দিরা রায়/গাংগুলীবাগান; পারমিতা সেনগুপ্ত/ইস্ট রোড, যাদবপুর; অজিত, সুনন্দা ও রুবি দাশগুপ্তা/ঝামাপুকুর লেন; সুমনা বসুচৌধুরী/পূর্বসিঁথি বাই লেন; রাজেশ ও জয়ীতা ভট্টাচার্য/করুণাময়ী, সল্টলেক; অতনু দে ও শান্তনু দে/প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড; সোনা, টুকটুকি, বুলা ও বুড়ি/দমদম; সৈকত ও মৈনাক সেন/সেলিমপুর রোড, কল্যাণ, সীমা, উমা, মিতা, সোমা, পাপু, বুবাই, টুবাই/মহিম হালদার স্ট্রিট; পিকু, বাবাই, বুবাই, বিপ্লব, শান্তনু, পলাশ, প্রকাশ/বেলেঘাটা; ভাস্কর ভট্টাচার্য/ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেনস; রূপা, শিবাজী, ডুডুল, জয় ও বাপী দাদা/স্যার গুরুদাস রোড; অনামিকা, অরুণাভ, অমিতাভ, অনন্যা, ডায়না ও রাজা/বৃন্দাবন ঘোষ লেন; স্বপ্না, অশোক/ইস্ট ইয়ার্ড কোয়ার্টার, খিদিরপুর; নূপুর, মধুছন্দা, মহাশ্বেতা, স্বপ্নাঞ্জন, দৃপ্তাঞ্জন ও ঈশাঞ্জন সাহা/বিজয়গড়; অরুণ, রুণু, রূপা, বুবুন, বিভূতি ও মঞ্জুদি/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড; শ্যামল, বিশ্বজিৎ, তপন, শ্রীমন্ত, স্নেহময়, রতন, বাসুদেব ও অন্যান্যরা/বেহালা এয়ারপোর্ট রোড; প্রমিত বসু/জয়নারায়ণ টিপি লেন; স্বপ্না, শিখা, সৌমিত্র ও দেবশ্রী/বডিগার্ড লাইন্স; শর্মিলা, সৌরভ, সুমিতা ও সুপ্রিয় সেন/বনহুগলী; শঙ্কর, সুভাষ, কণিকা, মণিকা, দীপিকা/দমদম ক্যান্ট; যূথিকা, কণিকা ও বাচ্চু/সেণ্টার সিঁথি রোড; শুক্লা, সুব্রত, শুচিতা ও শমিতা/লেনিন সরণী; তাপস ও অমিত/জে. কে. পাল রোড, নিউ আলিপুর; দেবরাজ, দেবজিৎ, দেবাঞ্জনা, দেবার্চনা, দেবাশিস ও সোমদত্তা/লেক টাউন; ভাগ্যধর হাজরা ও নির্মল সাহা/কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি; চিন্ময়ী কোলে/গোপাল ব্যানার্জী লেন;

।।২৪-পরগণা।।

পিনাকী দত্ত, চন্দ্রাণী দত্ত ও জয় মিত্র/বড় জোনপুর, কাঁচরাপাড়া; শুভময়, সোমা, ক্ষমা ও রাজু/খাটুরা; গৌরী, মামন, ছোটন ও দোলন/হালিশহর রেলওয়ে কলোনী, নবনগর; দীপঙ্কর ও শুভঙ্কর সাহা/সুভাষনগর, সোদপুর; সুকান্ত, সুশান্ত, সুপর্ণা ও সুপ্রিয়/ঘটক রোড, কাঁচরাপাড়া; শিবনাথ, সুদীপ্তা, সৌমশুভ্র ও সংযুক্তা মুস্তাফী/কাঁচরাপাড়া, চাঁদমারী রোড; অপর্ণা ঘোষ, অনন্যা ঘোষ/মুরগীমহল, ব্যারাকপুর; বনানী, কাকলী ও প্রদীপ্ত দেবনাথ/রহড়া; কিংশুক, শুচিস্মিতা ও মধুমিতা/ক্যানিং টাউন, সঞ্জয় পল্লী; বন্দনা, কল্যাণ, অনুপ, আলপনা ও কল্পনা বীরবংশী/কাঁচরাপাড়া; নৃপেন, বিদ্যুৎ, সনৎ, বিশ্বজিৎ, মণ্টু ও উৎপলা ভৌমিক/দক্ষিণ রায়পুর, বজবজ; টোকন, রিম্পা, রুণা, টুবাই/গুমর মঠ হাউসিং এস্টেট, সরেঙ্গাবাদ; মিঠু, দিপু, পার্থ, টিঙ্কু ও সজনা/সুকান্ত সরণী, ব্যারাকপুর; মধুবন্তী মজুমদার/বারুইপুর; ভুন্ডুলে, হারাধন, ভুটাই, নন্দন, চন্দন, জ্ঞান, ছন্দোগী/ধপধপি; বুবান, সমীর, গৌরী, বেবী, মলয়, অরুণ, রীতা, মুনমুন, রাজা, ইতু, তুহিনা ও রাণা/ইছাপুর, আনন্দমঠ 'সি ব্লক'; যুঁই, দীপ, মিলু, সিমি, মৌ, জামাইবাবু, বড়দি, শঙ্করদা, টুলুদি ও অন্যান্যরা/বন্দীপুর, রহড়া; জহরলাল, পান্নালাল, রাজীব, সোনালী, বিজলী, শ্যামলী, কৃষ্ণেন্দু ও বিপ্লব/হায়দাদপুর, গোবরডাঙগা; মালা, রাধা ও পার্থ/রবীন্দ্র পল্লী, গড়িয়া; জয়দেব চক্রবর্তী/নব ব্যারাকপুর; শান্তনু, মৌসুমী, লিলি, বন্যা, শিলা ও মালা বন্দ্যোপাধ্যায়/কাঁচড়াপাড়া; বাপী, জয়, খোকো, বাবু, ছটকু ও বাবাই/বজবজ; শিখা, মিঠুন, সর্বাণী, মা, শৌনিক, অলক/পাণিহাটি; সোমনাথ ভট্টাচার্য/নবজীবন কলোনী; মনা, রীণা, শ্রাবণী, স্বাধীন, বিদ্যুৎ, আশিস, গৌতম ও সুদেষ্ণা/জালখুরা; হ্যাপি, আনন্দ, সত্যেন, সায়ন, লাকি, লিপি, মুনু, মাণিক, রেণুকা,

ইরা, শুভ্রা, সৌরেন, সুভাষ রায়চৌধুরী/রাসমাঠ, বারুইপুর; দেবযানী ও কৃষ্ণা/বেলঘরিয়া; মিনতি, শিশির, পীযূষ, ভাস্বতী ও তপস্বী/বোড়াল; সৌমিত্রিশঙ্কর ও সুগতশঙ্কর উকিল/তালবাগান, ব্যারাকপুর; সমীরকুমার ঘোষ/লালপুল, ডায়মণ্ডহারবার;

।।হাওড়া।।

বুবু, টুটু, দিদিভাই ও পাপাই/আন্দুল পূর্বপাড়া; নির্মলেন্দু ঘোষ ও রমেশচন্দ্র দত্ত/বারুইপাড়া, ডোমজুড়; প্রদীপ, কাবেরী ও কৃষ্ণা বসু/মধুসূদন বিশ্বাস লেন, হাওড়া–১; সব্যসাচী ও অরুন্ধতী ব্যানার্জী/ভট্টাচার্য পাড়া লেন, হাওড়া–৪; গোলাপ, ভ্রমর, মানসী ও চিরঞ্জীব/বি. গার্ডেন; সুদীপ্তা মিত্র ও শুকুমার কোলে/কলুপাড়া লেন, সালকিয়া; সীমান্ত, বীথিকা, সপ্টো ও শ্যামল ব্যানার্জী/হালদার পাড়া লেন, হাওড়া–২; সাধনা, বিশ্বজিৎ ও দেবজিৎ/বি. গার্ডেন; জয়ন্ত, সুবিনয়, পলি, মলি ও টুকাই/ওলাবিবিতলা ১ম বাই লেন, হাওড়া-৪; অনুপ ও মনীষা হাজরা/আন্দুল; পিউ, পাপিয়া, পার্থ ও পীতম/এইচ রোড, বেলগাছিয়া, হাওড়া; সুশীল, বিশ্বনাথ, সোমনাথ, লম্ভুনাথ ও অমর/কাসুন্দিয়া রোড, হালদার পাড়া লেন; সুবিনয় চক্রবর্তী/ওলাবিবিতলা লেন, হাওড়া-৪; শাশ্বতী ও শান্তনু ব্যানার্জী/জি টি রোড, সালকিয়া; ননীগোপাল, মালতি, রামু, নিত্যানন্দ ও গীতা চক্রবর্তী/দক্ষিণ বাক্সাড়া, হাওড়া; দেবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়/মাকালতলা, বালী; সুদীপ বসু ও মৌসুমী বসু/গিরিশ ব্যানার্জী লেন, শিবপুর; বাবুল, বুবাই ও ডাবলু/সাঁতরাগাছি রেল কোয়ার্টার; বুলু, শর্বরী, রত্না, স্বপ্না, বাপী/নিউ জেনিন্স রোড, হাওড়া; অজন্তা ও ইলোরা/নস্করপাড়া লেন, হাওড়া-১; প্রদ্যোৎ, সুস্মিতা, প্রশান্ত, রেণুকা, দেবব্রত ও রীণা/বেলুড়; অচিন, সুনীতা, অরিন্দম ও অনির্বাণ মুখার্জী/কাসুন্দিয়া রোড, হাওড়া–১; মীরা, বিমান, রীতা, সব্যসাচী ও মামন মুখার্জী/গণেশ চ্যাটার্জী লেন, শিবপুর; চিত্রা, চৈতালী, মিত্রা, অমিত, ইন্দ্রনাথ ও চন্দ্রনাথ পাল/শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেন, শিবপুর;

।।নদীয়া।।

অশোক, অলোক, অনুপ, সুপ্রিয়া, কাজল, হিরো, রাজা ও সন্তোষ সাহা/বগুলা কলেজ রোড; শীর্ষেন্দু ও সম্পৎ/নোনাঘাটা, হরিণঘাটা; অঞ্জলি, শিখা, অনিমা, বনানী, বুলবুলি, মামণি, পিকলু, বাবাই ও পাপাই/গাংনাপুর; আশিস, টুটুল, বাঘা, রাসবিহারী ও নোটন/শক্তিনগর দরগা লেন; অরূপ, অনুপম ও রমেন পাল/শক্তিনগর বাগেনা পাড়া; বাবু, বাবন ও স্বাতী/কোলের ডাঙা, নবদ্বীপ; দিবানন্দ প্রামাণিক/ডাবরে পাড়া লেন, শান্তিপুর; টুটুল, লালটু, মিন্টু, সন্তু, তপু, বুড়ো, রাধু, তনা ও আদিত্য/আড়ংঘাটা; তপন ও শিপ্রা/চাকদহ, কাঁঠালপুলি; শিপ্রা, শিল্পী, নিশীথ/ষষ্ঠীতলা, নবদ্বীপ; মদন, নমিতা ঝাঁ/বগুলা; দেবযানী, চন্দ্রাণী, মুনমুনি, মাম্মা, লোপামুদ্রা ও সজল বসু/পায়রাডাঙা;

।।মেদিনীপুর।।

অমৃতময় ও বুবলি সিংহ/গড়বেতা; টুলু, বুবু ও টুটু/তালবাগিচা, খড়্গপুর-৬; পুপসী ও জালু/রেলওয়ে কলোনী, খড়্গপুর; বিশ্বজিৎ ও মোহিত/কর্মকুটির, ক্ষাড়গ্রাম; সুতপা, কনক ও রজত পাণ্ডা/মাতকাতপুর, মোহনপুর; বাবলু, গৌরী, গীতু, বিধান ও মাধবী ব্যানার্জী/ইন্দা রেল কলোনী, খড়্গপুর; দেবাশিস, সান্তুনা, সোনা ও পাপু/বাজটাউন, মেদিনীপুর; টুম্পা, ভোম্বল, পম্পা ও রিঙ্কু/বাজকুল; ফুটকি, লেবু, ফনফনি, উমা, মৃন্ময়, প্রণতি ও অম্বুজা ছন্দোগী/বরুরভেড়ি; মামণি, মধুসূদন ও প্রিয়া চক্রবর্তী। নটপটিয়া,কুঁকড়োহাটি; মিন্টু, রন্টু, পিকলু, লিউলি, সন্দীপ ও শর্মিলা/নিমপুরা, খড়্গপুর; বিল্টু আর চন্দন দত্ত/রবীন্দ্রনগর; ঋতা, নন্দিতা ও শুভ্রা বসু/নিউ ডেভেলপমেণ্ট রেল কলোনী, খড়্গপুর; শ্রীলেখা, মণিকা, সৃপ্তি ও স্বর্ণেন্দু/গড়বেতা;

।।হুগলী।।

শেলী, সঞ্চিতা, জবা, মিতা, জয়া, রাজু ও অন্যান্য/লেওড়াফুলি; রাজা, তাপস, গৌতম, সুপ্রকাশ, অরুময়, উজ্জ্বল, মমতা, কালিদাস, বিধান, কল্লোল, সুদীপ্ত ও পার্থ/আখড়া, গুপ্তিপাড়া; সঞ্জয় ও সৈকত দত্ত/মাহেশ; কমল রায়/কে.এম. ভট্টাচার্য স্ট্রিট, শ্রীরামপুর; কালিদাস, বুলা, সন্ধ্যা, সুজাতা ও দুর্গাদাস ভট্টাচার্য/জলাঘাটা, সিংগুর; অরিন্দম, অপর্ণা রায়, রমাপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ ও মন্দিরা সেনগুপ্ত/কোন্নগর, কানাইপুর কলোনী; অজয়, মম ও মৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়/ডানলপ, সাহাগঞ্জ; রিঙ্কু, টিঙ্কু ও অনল মুখার্জী/ চুঁচুড়া স্টেশন কোয়ার্টার্স; শিখা হোতা ও শ্রাবণী ঘোষ/আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়; ইন্দ্রনীল ও বেদব্রত চ্যাটার্জী/গোপালবাগ, চন্দননগর; নমিতা, রমা, অচিন্তা, প্রশান্ত ও জয়ন্ত ঘোষ/আরামবাগ; সজল, অপূর্বা, তন্দ্রা, রিক্তা, শুভ্রা/বিবেকপল্লী, শেওড়াফুলী; লম্পা, সুতপা ও সুজাতা/চুঁচুড়া; দীপা, সীমা, মুন, রিণি, ঋতু ও ভুল্কাই ঘোষ/বৈদ্যবাটী; বেণী, পুষ্প, অসীম ও কাকলী চক্রবর্তী/ত্রিবেণী; পিয়ালী ও কুহেলী চট্টোপাধ্যায়/শিবতলা স্ট্রিট, ভদ্রকালী; পাপিয়া, রীতা, প্রবীর ও রাজীব চন্দ/মানসপুর, ব্যান্ডেল; সুপ্রকাশ, সুপ্রসন্ন, সুপ্রবুদ্ধ, সুপ্রতিম, সুপ্রভাত, সুপ্রিয়া, সুজিতা ও পাম্পু/কানাইপুর; পিকু ও সুমন/এল.এম. ভট্টাচার্য স্ট্রিট; রাজা, রানা, জয়ন্তী, দেবব্রত, মীরা/ব্যানার্জীপাড়া, চন্দননগর; উৎপল, বন্দনা, বাবুয়া, টুকাই, বুই, পিয়া/ঘোরাবাগান, ব্যান্ডেল; শুভ্র ও শমী গাংগুলী/নিত্যানন্দপুর;

।।বর্ধমান।।

রোজি, রিনি, মাধুর/বেনাচিতি, দুর্গাপুর–১৩; অশোককুমার নাগ ও অমরেন্দ্রনাথ নাগ/শুড়েকালনা; স্বপন, ঝর্না, ছবি, টুলা, অসীম, আশিস, অমিত, মিতালী, গীতালি, রিংকু, সুচি ও বাবাই/ঘটকপাড়া, কালনা; কৌশিক, মহুয়া, বুয়া, টুম্পা, পাপুন/শাঁখারিপুকুর, বর্ধমান; অনিরুদ্ধ ও মিঠুন গোস্বামী/শিবাজী রোড, দুর্গাপুর; নির্মলেন্দু, শ্যামলেন্দু, তাপস ও শুভেন্দু/টেংগাবেড়িয়া, বর্ধমান; অমিতাভ, দেবাশিস, সুলেখা, কবিতা ও দিপালী/বিধাননগর হাউজিং কলোনী, দুর্গাপুর, পম্পা ও তোতা/কোক ওভেন কলোনী, দুর্গাপুর; শুভ্রজিৎ ও মহাশ্বেতা/বি-২, দুর্গাপুর; অমিত ও পম্পি মুখার্জী/সেন র‍্যালে, আসানসোল; অজয়, তরুণ, পিন্টু, রবি, টুনু, রতন, সঞ্জয়, গৌতম, খোকন ও সাবু/বার্ণপুর, আমবাগান; নন্দিনী ও প্রবুদ্ধ/বিধাননগর, দুর্গাপুর; গোপাল ও আনন্দ/কুড়মুন পূর্বপাড়া, বর্ধমান; শশাংকশেখর, সুখেন্দুশেখর, দিবেন্দুশেখর, দীপঙ্কর ও ডাঃ আশ্বাস/পাথরঘাটা, বহরকুলি; কল্পনা, গৌরী, দিদি দাদাভাই ও বুল্টি/কালনা; কৌশিক গাংগুলী/কল্যাণপুর হাউজিং এস্টেট, আসানসোল; বিদিশা, বৈশালী ও শ্রাবন্তী দাস/ডিসেরগড়, বর্ধমান; বিমলেন্দু, শ্যামল, সৌমিত্র ও স্বাতী চৌধুরী/মধুপুর; মৌসুমী ও শুভশ্রীপ/কোকওভেন কলোনী, দুর্গাপুর; পাম্পি, টিয়া ও সুপ্রিয় রায়/বড়বেলগোলা, বর্ধমান; পার্থ, রাজু ও মুনমুন কুমার/কেওটারা; তাপু, হারু, জীতেন, কৃষ্ণ, রামু ও অন্যান্যরা/অমররাগড়; মধুমিতা, সঞ্চিতা, রাজীব ও চৈতালী/খান্দরা; দেবীপ্রসাদ, ইন্দিরা ও মন্দিরা/বর্ধমান; সোনাই ও বুটুল/কোকওভেন কলোনী; ইন্দ্রাণী চ্যাটার্জী ও মুনমুন চৌধুরী/বি. ও. জি. এল. কলোনী, দুর্গাপুর; আশিস, মধুছন্দা, হীরু, রীতা, মণি ও জবা/বালিয়াড়া, বৈকুণ্ঠপুর; সুকুমার, নবকুমার, রাজকুমার ও দিদি/বেলরুই, সীতারামপুর; সঞ্জীবকুমার/অমররাগড়; ঋতা, জয়ন্তী, সর্বাণী ও সুজাতা/ছোটনীলপুর; বৃন্দাবনদা, টুম্পা, মোম, শিল্পু, বাপ্টু ও লম্পা/খালুইবিল মাঠ, বাদামতলা; মিতা, রীতা, মিঠু, মিতুল, বিমল ও বাপী/খালুইবিল মাঠ; মণি ও ছোটন/ওয়েস্ট আপকার গার্ডেন, আসানসোল; সংঘমিত্রা ও সোনালি মুখার্জী/অরবিন্দ এভিন্যু, দুর্গাপুর, টুনু, বুনু,পিংকি ও অন্যান্যরা/রাণীগঞ্জ, কুমারবাজার;

।।বীরভূম।।

নবনীতা ও মধুমিতা ঘোষ/রবীন্দ্রপল্লী, সিউড়ি; বোধিসত্ত্ব, সৌম্যসত্ত্ব, প্রজ্ঞাসত্ত্ব ও শূন্যসত্ত্ব মণ্ডল/কলেজ রোড, সাঁইথিয়া; দেবীপদ, মীনাক্ষি, চন্দনা/বোলপুর, ধর্মরাজতলা; অমিচাচা কাকামণি, রাঙাকাকা, ছোট্কা, পিতামনা, বাণ্টি, আম্মা, পিসি ও দাদুভায়েরা/সাঁইথিয়া; মানিক, স্বপ্না, নীরেন ও সোনালি/সাঁইথিয়া, কামারপাড়া;

।।বাঁকুড়া।।

বাবলা ও নিমুখেপা/কালীতলা রোড, মালিয়াড়া; মৌসুমী, মৌমিতা, পৌলমী, ভারতী ও দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী/মোলড়ুবকা, নতুনগঞ্জ; লাবু ও বুলু/বাঁকুড়া; নন্দ, পূর্ণিমা, নিবেদিতা, নরেন ও গৌর/নতুন চটী, যোগেশপল্লী;জনার্দন রায়/উখড়াডিহি; বিশ্বরূপ, শ্রীরূপ, নন্দগোপাল, লক্ষ্মীশ্রী, অপূর্ব, ভজু ও অজিত মিত্র/গংগাজলঘাটী, বাকুড়া; অনন্ত, টুকটুকি, শুভ্রা, রাজশ্রী, জয়শ্রী ও রাণা/গংগাজলঘাটী; শিপ্রা, শুভ্রা, কাবেরী ও ধনঞ্জয় সিংহ/চৌগাল, বাঁকুড়া; সৌমিষ্ঠ ও সৌরভ সাঁতরা/স্কুলডাঙা, বাঁকুড়া; বিশ্বনাথ, সজল, আনন্দ ও সমীর/গংগাজলঘাটী; অমিয়, প্রতিভা ও প্রণব দত্ত/বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া; স্বপন, অর্চনা ও অনিন্দিতা/মলিয়ান; বগলানন্দন, মহুয়া, শ্রীকুমার, সুদীপা ও খোদাবক্স/গুন্দাথ;

।।মালদহ।।

কুমু, বিশু, ভারতী, পাপন ও পম্পা/খরবা; মন্দিরা ও পাপি/মহেশমাটি; বাপী বেলা, বাবুয়া ও ববী দত্ত/মহেশমাটি, সাঁকোপাড়া; রীতা, রজত, অভিষেক সাহা/বিবিগ্রাম রোড; খোকন, উত্তম, কৌশিক, কালু, বাবন, অর্পণ, ঝন্টু, মিন্টু ও বাবুয়া/ঝলঝলিয়া, রেল কলোনী; বুড়ি ও অপর্ণা/মহেশমাটি; অভিনন্দন, চিত্তরঞ্জন ও শিখা ঘোষ/বাঁশবাড়ি; অশোক, কৃষ্ণা, কাকলি, কৌশিক, ইন্দ্রাণী, চন্দ্রাণী ও বিশ্বজিৎ, বাসব ও সৌরভ ব্যানার্জী/বাঁশলীতলা; আনন্দ, পুতুল, অঞ্জন ও রঞ্জন দাস/পুড়াটুলি, রাজেন্দ্রবাবু লেন;

।।জলপাইগুড়ি।।

জনা, রুণা, দিদি ও অচিন্তাদা/নয়াবস্তী; পার্থসারথী, মহুয়া, সব্যসাচী ও শিখা চন্দ/মংগলবাড়ি, চালসা; কৌশিক, সৌভিক ও সৌরভ/জলপাইগুড়ি;

।।পুরুলিয়া।।

সুলগ্না, অনিন্দ্যসুন্দর ও সৃজনী ঘোষ/আদ্রা; রত্না, স্বপ্না, বিপ্রতীপ, কৃষ্ণা, সোনালি ও মৌমিতা/চন্ডী কর লেন, পুরুলিয়া; চিরন্তন, উত্তরণ, দোয়েল, কাবলী, চম্পা, চম্পক ও রুম্পা/নডিহা, পুরুলিয়া; ধ্রুবজ্যোতি মিত্র ও দীপককুমার চৌবে/আনাড়া; টুটুন, দোলন ও বাপ্পা/আদ্রা; দিলীপকুমার চৌধুরী/মধুপুর, মানবাজার, পুরুলিয়া; শিউলি, মুন্নি, অনু ও কালুদা/সান্তালডি; তাপস, অমরেশ ও পার্থসারথী/পুস্তক ভবন, মানবাজার; অরুণ ও বরুণকুমার দাস/আদ্রা, রেল কোয়ার্টার; মিনু, টুকু, মিঠু, ভাস্কর টিংকু ও দাদু/আই.টি.আই, রঘুনাথপুর;

।।মুর্শিদাবাদ।।

মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়/চাটার্জীপাড়া, বেলডাঙা; পারুল ধর, শ্যামাচরণ দাস, দুর্গা পাল, গণনাথ রায় ও অন্যান্যরা/দেবীপুর মহান্ত ধেংরাম দাস উচ্চ বিদ্যালয়, জিয়াগঞ্জ; বিমান, রবি, রেখা, সীমা ও জয়ন্তকুমার বৈদ্য/ডোমকল; আশিস, দীপ্তি, দেবলীনা ও দীপ্তাশীষ/কে. কে. ব্যানার্জী রোড, বহরমপুর; স্বপন, জয়া, বিশু, গীতা, অলোকা, বরুণা অরুণা ও অন্যান্যরা/নিমতলা পাড়া লেন, খাগড়া; প্রশান্ত, সুকান্ত, কবিতা, পারমিতা, মিতুন, মা-মণি, মঞ্জু ও সতোন সাহা/জিয়াগঞ্জ;

বাকি উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায়।

শব্দমালা

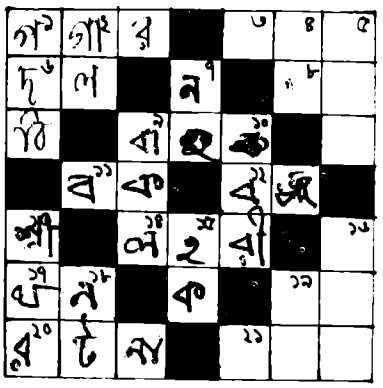

এটি তৈরি করেছেন গৌতম গলুই/দাশনগর, হাওড়া-৫

সূত্রঃ

ওপর-নিচ

[১] সকলেরই আছে এটা বলছি না মিছে রে
পরিচয় হয় না তো যদি তারে দিই ছেড়ে!

[২] দিলে তুমি খুব খুশী নিয়ে যেতে চাও তো
সাবধান, রেগে যাবে যদি এটা দাও তো।

[৪] শেষ কালে আছে পা, আগে যদি আনো রে
গাছ এক পেয়ে যাবে মানো নাই মানো রে।

[৫] লোহা নয়, তামা নয়, নয় সে তো কাঠ রে
নয় গিরি দুর্গম, এ তো ঘন বন রে।

[৭] রাজা বলে, রাণী বলে, বলে রাজপুত্র
কবি যদি বলে 'না' সেইটাই সূত্র।

[৯] সবটাকে গাছে পাবে, পুরোটাকে না রেখে
যদিই বা দাও কেটে জল পাবে তা থেকে।

[১০] যত খুশি খুঁজে যাও পাবে না তো খাতাতে
পেতে পারো খুঁজে দেখ রমণীর মাথাতে।

[১৩] যত বদ শয়তান, চোর-খুনী-বদমাস
পুলিশের পাহারাতে এখানেই করে বাস।

[১৫] এটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে না তো ওঝাতে
ব্যবহৃত হয় শুধু ঠিক কথা বোঝাতে।

[১৬] হঠাৎ-ই হানা যদি দেয় কোনোও দিন এসে
সারা গ্রাম ছারখার হয়ে যাবে নিমেষে।

[১৮] যাত্রায় পেতে পারো পাবে নাকো ভোজনে
আগু পিছু উল্টেই পেয়ে যাবে ওজনে।

[১৯] সবাই মিলে ধোলাই দিলে এক সাথে কি?

পাশাপাশি

[১] লাঠি হাতে খুড়ো যেই ছুটে আসে বাইরে
একে পার হয়ে তবে হাঁফ ছাড়ি ভাইরে।

[৩] দুরন্ত ঘুড়িটাকে দিতে গিয়ে দন্ড
–বাতাসে তা হয়ে যায় পন্ড।

[৬] একা নয় একসাথে সব্বাই এসেছে
দংগল বেঁধে দেখি খেলাতেই মেতেছে।

[৮] আজ পুজো শেতলার বন্ধ যে রান্না
জল দেওয়া ভাত আছে শিগগির আন না।

[৯] সে তো নেই খামারে, নেই সে তো চাষে রে
যত কিছু সংবাদ বয়ে নিয়ে আসে রে।

[১১] সূত্রটা চুপিচুপি বলি শোনো বৎস
জলার ধারে সে ঘোরে ধরবেই মৎস্য।

[১২] গেরোটাই ফস্কেছে আঁটুনির ভরসায়
দেখা'শোনা তার মেলে দেখি ঘন বর্ষায়।

[১৪] শেষ বাদে নাও বাপু আসে যায় কার-এ তে
দেখা তার মিলবেই সাগরের পাড়েতে।

[১৭] সূত্রটা মেলাতেই হোক যত কষ্ট
পাতলা সে নয় মোটে বলে দিই স্পষ্ট।

[১৯] সাধারণ অংকটা দেখি করে রাখতো
রাজাদের সৈন্যরা এখানেই থাকতো।

[২০] গুজবটা উঠেছিল নেহাৎ-ই জড়িয়ে
লোকমুখে সেইটাই পড়ে দেখি ছড়িয়ে।

[২১] সহজেই বলি শোনো কাজ নেই ধকলে
ইনি যদি না ড়েন ঠকে যাবে সকলে।

[উত্তর আগামী সংখ্যায়]

অজিত কুমার দে স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

মণি-মুক্তো

সলিলকুমার বসু

ভাই মুক্তো,

এর আগে তোকে চিঠি লেখার মতো পরিস্থিতি কোনো দিন আসেনি। কারণ জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কখনো আমরা একদিনের জন্যও আলাদা থাকিনি।

আজ তাই তোকে এ চিঠি লিখতে গিয়ে আমার দুচোখ জলে ভরে আসছে। তুই আমাকে যে কতটা ভালবাসিস তা আমার থেকে বেশি কেউ জানে না। কিন্তু কি করবো বল, এছাড়া অন্য কোনো উপায় আমি খুঁজে পাইনি।

পুরোনো অনেক কথা মনে ভিড় করে আসছে। মনে আছে? সেই যেদিন এ্যাংক্লেট কেনার জন্য পয়সা চুরি করে ছিলাম বাবার পকেট থেকে? চুরি করলাম আমি, আর, মার খেলি তুই। তার ওপর রাত্রে শুয়ে শুয়ে তুই বলেছিলি, মণি, এরকম আর করিস না।

এরপর থেকে টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে তুই আমার শখ মিটিয়েছিস। আর সব জেনেও আমি হাত পেতে তা নিয়েছি।

আমার অনেক দোষ তুই নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিস। তুই জানতিস আমি যে শাস্তি পেতাম তার থেকে কম শাস্তি তুই পাবি। কারণ তুই পড়াশোনায় ভাল।

অথচ মজা দ্যাখ সকলে জানে আমিই বেপরোয়া, দুঃসাহসী, কিন্তু আমি ভাল করেই জানি যে আমার চেয়ে তোর সাহস অনেক বেশি। আমরা যমজ অথচ আমাদের চেহারায় কত তফাৎ! তুই পড়াশোনায় ভাল আর আমি একদম নীচের দিকে। তুই খেলা ভালবাসিস বোধ হয় শুধু আমারই জন্যে! আমার খেলার দিন মাঠে তোকে কেউ কোনোদিন অনুপস্থিত হতে দ্যাখেনি। আবার তোর গল্প কবিতার প্রথম শ্রোতা তো আমিই।

আমাদের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে কোনোদিন ডিম, মাছ, বা মাংস হলে তোর ভাগ থেকে অর্ধেক আমায় দিয়ে দিতিস, আপত্তি করলেও শুনতিস না। বলতিস মণি, তুই খেলাধুলো করিস, তোর এসব একটু বেশি খাওয়া দরকার। অথচ দ্যাখ পড়াশোনার জন্য তোরও তো ওসব দরকার।

পরীক্ষার রেজাল্ট তোকে একলাই আনতে যেতে হবে। কলেজেও ভর্তি হতে হবে একলা, কলেজে যেতেও হবে একা। আমি তখন কোথায় থাকবো কে জানে?

তুই হয়তো ভাবছিস আমি হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম কেন? না রে, হঠাৎ এ সিদ্ধান্ত আমি নিইনি। যেদিন শুনলাম বাবা মাকে বলছেন, দিন দিন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, এরপর রেজাল্ট বের হলে মণি-মুক্তোকে কলেজেও তো ভর্তি করাতে হবে। মুক্তো তো ভাল ভাবে পাশ করবেই, মণিও এবার পড়াশোনায় খুব মন দিয়েছিল। আমার এই সামান্য আয়ে দুজনের কলেজের খরচা কেমন করে টানবো তাই ভাবছি।

সেই দিন থেকেই আমার চিন্তা, কেমন করে এ সমস্যার

চিঠিটা শেষ করতে ইচ্ছে করছে না।

সমাধান করা যায়।

বাবা মা তো জানেন না যে আমি যদি এবার পাশ করি (যদি কেন নিশ্চয়ই করবো) তো সে শুধু তোর জন্য।

পাশ করলে ফের তোরই জেদাজিদিতে আমাকে কলেজে ভর্তি হতে হবে। তুই একা হলে বাবা তোর পড়ার পেছনে যে টাকা খরচা করতে পারবেন, আমি থাকলে সেটা দুভাগ হয়ে যাবে। তুইও তোর পড়ার সময় থেকে আমার জন্য অর্ধেকটা নষ্ট করবি। ফলে যে ভাল ফল তুই করতে পারতিস, তা হয়তো হবে না।

তাই অনেক ভেবেই তোর কাছ থেকে নিজেকে উপড়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিলাম। জানি তুই দুঃখ পাবি ঠিক আমারই মতো। তবুও, দেখিস এতে তোর ভালই হবে। আর তোর ভাল হলে তো আমারও আনন্দ হবে।

মুক্তো, আমার এই প্রথম চিঠিটা শেষ করতে ইচ্ছে করছে না। কত কথাই মনে ভিড় করে আসছে। কত কথাই লিখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সময় নেই তাই শেষ করতে হচ্ছে।

যেখানেই থাকি আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা তোর সঙ্গেই থাকবে।

ইতি

তোর মণি

ছবি : দিলীপ দাশ

অজিত কুমার দে স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

ভ্রাতৃস্নেহ

দিলীপ ঘোষ

সুহাস, ও সুহাস ওঠ ভাই, পাঁচটা বেজে গেল। চা হয়ে গেছে। খেয়ে নিয়ে পড়তে বোস।

প্রতিদিনই কাক-ডাকা ভোরে চা জলখাবার করে হাঁড়িতে ভাত চাপিয়ে প্রভাস মন্ডল হাঁক দেবে সুহাসকে।

ওরা যখন মা-বাবাকে হারিয়েছে, সুহাসের বয়স তখন বড় জোর বছর চারেক। আজ কুড়ি বছরের সুহাস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। কোনোদিন প্রভাস তাকে বুঝতে দেয়নি মা বাবা হারানোর বেদনা।

মায়ের মৃত্যুর পর ভাইয়ের জন্য নিজের লেখাপড়া ছাড়তে হলো প্রভাসকে। আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল চাকরির, কিন্তু কে দেবে ১৫/১৬ বছরের ছেলেকে চাকরি। বাজারে তরিতরকারি বিক্রি করে চালাল বেশ কয়েক বছর। তারপর অনেক চেষ্টা চরিত্র করে এক সরকারী অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর চাকরিটা যোগাড় করেছিল। সেই থেকে চলেছিল তার ভাইকে বড় করবার সাধনা! ভালো স্কুলে কলেজে পড়িয়েছে। ভালো করে বি.এস.সি পাশ করবার পর ভর্তি করেছে এম.এস-সি তে। দারুণ অর্থসংকটের মধ্যে পড়েও হাল ছাড়েনি প্রভাস তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, যে কোনো ভাবেই হোক ভাই-এর পড়াশুনার খরচ চালাবে আর আজও চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশী, এমন কি নিজের ভাইও বুঝতে পারে না এই সামান্য টাকাপয়সায় কি ভাবে সুহাসের পড়াশুনার খরচ চালিয়ে যাচ্ছে প্রভাস! লোকে তার রোজগার সম্পর্কে সন্দেহ করতে ছাড়ে না। সুহাস চেয়েছিল নিজে দু একটা টিউশনি করে নিজের পড়ার খরচটা চালাবে। কিন্তু তার দাদা তাতে রাজী হয়নি। বলেছিল, খরচের ভাবনা আমার। তুমি শুধু ভালো ভাবে পাশ কর, মানুষের মতো মানুষ হও। দু একজন যখন তার দাদার রোজগার সম্পর্কে একটু আধটু কটাক্ষ করে তখন তার মনের কোণে সংশয় আর সন্দেহের ঈষৎ মেঘ জমে। মনে মনে সে ভাবে মোটা মাইনের চাকুরেরাও সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে, অথচ তার দাদা কত সহজভাবে তার লেখাপড়া সহ সমস্ত সংসারের খরচ চালাচ্ছে! তার সন্দেহ আরো বাড়ে যখন সে দেখে ইদানিং তার দাদা বেশ রাত করে ফিরছে। অফিস তো বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত, কেন এত রাতে ফেরে তার দাদা?

গতরাতে দাদা রাত দশটায় ফিরেছে, তখন সুহাস তার পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত। জীবনেরও চরম পরীক্ষা! তাকে ভালোভাবে পাশ করতেই হবে। তার স্নেহময় দাদার মর্যাদা তাকে রাখতেই হবে। কিন্তু সে কিছুতেই মন বসাতে পারছে না, দাদা না ফেরার জন্য। মনের মধ্যে একই প্রশ্ন, এত রাত পর্যন্ত দাদা কোথায় থাকে? ছটফট করছে সুহাস। এত রাত হলো, দাদা ফিরবে কখন!

সকালে দাদার স্নেহমাখা ডাকে জেগে ওঠে সুহাস। গত রাতের ভাবনাটা আবার তাকে পেয়ে বসল। চা জল খাবার খেয়ে পড়তে বসল রোজের মতো। কিন্তু এক রাশি ভাবনা তাকে পড়ায় মন বসাতে দিচ্ছিল না....

প্রভাস তার জন্য পরিপাটি করে খাবার ঢেকে রেখে দিয়ে নিজে কোনো রকমে একটু খেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

অফিস ছুটির পর মুটেগিরি পর্যন্ত করে।

প্রভাস চলে গেলে সুহাস যথাসময়ে খেয়ে নিল। সুহাস আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আজ দেখবেই দাদা ছুটির পর কি করে।

বিকেলে ছুটির আগেই সে হাজির হলো দাদার অফিসের সামনে। গোপনে অনুসরণ করে সে,দেখে দাদা হাওড়া স্টেশনের দিকে যাচ্ছে। সুহাসও যায় তার পিছন পিছন। দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে দাদার গতিবিধি।

কুলি ! কুলি ! হাঁক দেন এক ভদ্রলোক, হাতে তাঁর একটা ব্যাগ আর সামনে রাখা বিছানাপত্র। প্রভাস এগিয়ে যায়। বিছানাটা নিয়ে মাথায় রাখে, ব্যাগটা আর এক হাতে নিয়ে ভদ্রলোকের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে।

–চল, ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। তাড়াতাড়ি পা চালাও। বিছানা আর ব্যাগের ভারে নুয়ে পড়েছে প্রভাস। এগিয়ে যাচ্ছে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে। সুহাসের চোখ ফেটে জল আসে। দাদা অফিস ছুটির পর মুটেগিরি পর্যন্ত করে। আর তাকেই সন্দেহ করে সুহাস ! ছিঃ ছিঃ ! সুহাস আর নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে না। দৌড়ে গিয়ে দাদার সামনে দাঁড়ায়। হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে যায় প্রভাস পথের মাঝে মাথায় ও হাতে বোঝা নিয়ে। যেন খোদাই করা পাথরের মূর্তি।

সহসা দাদার দুটো পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, তুমি যে এত বড়--এত মহৎ আগে এমন ভাবে বুঝিনি ! গোপনে তোমাকে অনুসরণ করে আজ দেখতে বেরিয়েছি। তোমাকে সন্দেহ করে মহাপাপ করেছি, আমাকে ক্ষমা কর দাদা !

ছবি : দিলীপ দাশ

মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ (দেবীপুর) থেকে শংকর নারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর ঠাকুমা 'গিরিবালা ভট্টাচার্যর নামে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

'গিরিবালা ভট্টাচার্যের নামে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

বিষয়বস্তু : প্রকৃতি প্রেমিকের আত্মকাহিনী

লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০শে পৌষ।

প্রতিযোগিতার প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখা আগামী চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার : ১৫ টাকা

দ্বিতীয় পুরস্কার : ১০ টাকা

ঈশ্বরমণি কুন্ডু স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

লটারির টিকিট

রত্না রায়

গ্রীষ্মের ছুটি পড়ে গেল। খুব ইচ্ছে করে গল্পের বই পড়ে, বেড়িয়ে, আইসক্রীম খেয়ে আর টিভি দেখে গ্রীষ্মের ছুটিটা কাটিয়ে দিই। কিন্তু তা হবার কি উপায় আছে? ছুটি ফুরোলেই পরীক্ষা, রেজাল্ট খারাপ হলে দুর্ভোগ আছে। তার উপর আছে ঐ টিয়াদি।

ঠিক দুপুর বেলায় জেঠু আর বাবা যখন অফিসে চলে যান, জেঠিমা পান মুখে দিয়ে পাশের বাড়ির জেঠিমার সংগে তাস খেলতে যান, মা রান্নাঘরের কাজ সেরে খাটে শুয়ে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, আমগাছের ঘুঘু পাখিটা তখন ঘু–ঘু করে গান করতে থাকে। সেই সুযোগে যদি টিটো আর আমি কোনোদিন চুরি করে আইসক্রীম খাই বা পুরানো 'শুকতারা' আর 'টিনটিনের' বান্ডিলটা নিয়ে বসি অমনি আড়চোখে টিয়াদি সেটা দেখে নেবে। তারপর বিকালে চা খাবার সময় ঠিক মা-মণির গলা শুনতে পাবো, টিটো আর রাজু মজা দেখাচ্ছি।

ফার্স্ট প্রাইজ কত জানিস? ফোর ল্যাকস

সেদিন একটা মজার ব্যাপার ঘটল। সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ টিটো পকেট থেকে একটা ছোট্ট সাদা খাম বের বের করে আমার চোখের সামনে নাচিয়ে বলল, বল তো এটা কি? ঐটুকু খামের মধ্যে কি এমন মজার জিনিস থাকতে পারে ভেবে পেলাম না। টিয়াদি ঘাড় বেঁকিয়ে একবার তাকাল। টিটো আমাকে চোখ মটকে বলল, পারলি না তো? লটারির টিকিট, এই দ্যাখ্।

তারপর চোখ দুটো গোল্লা পাকিয়ে বেশ জোর গলায় বলল, ফার্স্ট প্রাইজ কত জানিস? ফোর ল্যাকস্, বলেই সে আমার মুখের কাছে চারটে আঙুল তুলে ধরল। আমি তার চারটি আঙুলকে কি অদ্ভুত জিনিস ভেবে হাঁ করে সেই দিকে তাকিয়ে রইলাম। টিয়াদি বলল, ফোর ল্যাকস্ পেলে তুই কি করবি টিটো?

টিটো দু-ঠোঁটের কোণ ঝুলিয়ে বলল, হুঁ, আমি যা করব ভেবেছি শুনলে তোরা অবাক হয়ে যাবি।

টিয়াদি খিলখিল করে হেসে বলল, তোর ঐ শিশিতে শিশিতে পোষা টিকটিকি, গিরগিটি, সাপ, ব্যাঙ, কেঁচো, পিঁপড়েদের নিয়ে আর 'প্লেয়ার'দের ছবিগুলো নিয়ে একটা সংগ্রহশালা বানাবি, পৃথিবীর লোক দেখে অবাক হয়ে যাবে। আর তুই-ও একটা শিম্পাঞ্জির পোশাক পরে খাঁচায় ঢুকে কলা খাবি আর ডিগবাজি খাবি, বলতে বলতে টিয়াদি হেসে গড়িয়ে পড়ল। টুকটুকি পাশেই ছিল। কিছু না বুঝে সেও হাসতে লাগল। টিয়াদির ওপর আমার খুব রাগ হচ্ছিল। টিটোও সাংঘাতিক চটেছে। ওকে শান্ত করার জন্য আমি বললাম, টিয়াদি অত হেসো না। যদি সত্যি সত্যিই টিটোর ভাগ্যে লটারি ওঠে তখন? টিটো এবার একটু নরম হয়ে জোর গলায় বলল, বুঝলি রাজু, যদি লটারি পাই প্রথমেই কি করব জানিস? যারা অসহায়, অক্ষম তাদের জন্য একটা আশ্রম গড়ব।

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, আর?

আর করব একটা পশুশালা। কত ভয়ংকর পশু যে সেখানে থাকবে দেখলে অবাক হয়ে যাবি।

আর?

তুই, আমি আর কাকু–তিনজন, ব্যস, আর কেউ না।

তিনজনে কি?

বেরিয়ে পড়ব ইন্ডিয়া ভ্রমণে।

আড়চোখে দেখলাম টিয়াদি গালে হাত দিয়ে বইয়ের পাতাগুলো একটা একটা করে উল্টে যাচ্ছে। আর বাঁ পাটা খুব জোর নাচাচ্ছে। তার মানে সে খুব জোর রেগে যাচ্ছে। ইন্ডিয়া ভ্রমণের তালিকা থেকে বাদ পড়ায় টুকটুকি মেঝেয় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না। বড় গরম সারারাত

ধরে চলল টিটোর আর আমার শলাপরামর্শ। পাশের ঘর থেকে জেঠিমার নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। টিয়াদির কাশির শব্দও পাচ্ছি। তার মানে টিয়াদিও ঘুমোয়নি। ইন্ডিয়া ঘুরতে যাওয়া হলো না বলে ও বোধহয় দুঃখে ঘুমোতেই পারছে না।

পরের দিন দুপুরে চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে টিয়াদি আমায় জিজ্ঞেস করল, এই যে টিটোর রাইটহ্যান্ড, লটারির রেজাল্ট কবে বার হবে রে?

আজ কাল বাদ দিয়ে–রবিবার, কেন?

টিয়াদি ফোঁস করে উঠল, কেন আবার এমনি।

রবিবার সকালে টিটো নাচতে নাচতে বাড়ি এসে বলল, ইন্ডিয়া না হোক ভূ-স্বর্গ ভ্রমণ আমাদের হচ্ছেই–এই দ্যাখ লটারিতে দশ হাজার টাকা উঠেছে।

আমি আর টিটো আনন্দে আত্মহারা হয়ে সারা ঘরময় নাচতে লাগলাম। আমাদের হুল্লোড়ে সকলে ছুটে এল। অবাক হয়ে ওরা আমাদের দেখতে লাগল। শেষে বাবার ধমকানিতে আমাদের নাচ থামল। তাকিয়ে দেখি বাবার হাতে 'রেজার' আর গালে ফেনা, জেঠুর হাতে আধখানা রুটি, জেঠিমার হাতে নাড়ুগোপাল, মায়ের হাতে বেসন গোলা আর টুকটুকির হাতে জেলি মাখানো আধখাওয়া পাঁউরুটি। যে যে অবস্থায় ছিল ছুটে এসেছে। খবর শুনে শেষে সকলেই নাচবার মতো অবস্থা। কেবল টিয়াদি গানের স্কুল থেকে ফিরেই বিছানায় পড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। টুকটুকিও বাড়ি ফাটিয়ে কান্না আরম্ভ করল। বাবা আমাদের কাশ্মীর বেড়াতে নিয়ে যেতে রাজী হলেন। টিয়াদি আর টুকটুকির কান্না দেখে টিটো ওদের সংগে নিতে রাজী হলো। শেষ পর্যন্ত বাড়ি সুদ্ধু সকলে মিলেই কাশ্মীর যাওয়া স্থির হলো।

এইতো গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা কাশ্মীর ঘুরে এলাম।

ছবি: দিলীপ দাশ

ঈশ্বরমণি কুন্ডু স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

শপথ

সুব্রত পন্ডিত

ছেলেরা তোমরা এত গোলমাল করছ কেন? গরমের ছুটিতে দেশবিদেশ ঘুরে এসে বন্ধুদের সেই সব গল্প শোনাচ্ছ বুঝি?

ছেলেদের মধ্যে অপূর্ব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, না স্যার, আপনার মনে আছে কিনা জানি না, গরমের ছুটির আগে ভূগোল ক্লাসে আপনি পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। আপনি বলেছিলেন–এটা বড়ই দুঃখের ব্যাপার যে আমাদের দেশের বন-জংগল কেটে ফেলা হচ্ছে। এদিকে গাড়িঘোড়া, কল-কারখানার প্রচলন অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় বিষাক্ত কার্বনে বাতাস দূষিত হচ্ছে, শব্দ দূষিত হচ্ছে, শহরাঞ্চলে কারখানার অশুদ্ধ জল জমে রোগ-জীবাণু ছড়াচ্ছে। গ্রামাঞ্চলেও এ সব দূষণ দেখা যাচ্ছে–তবে শহরগুলির অবস্থা বড় ভয়াবহ! অথচ সংবাদপত্রে এতো লেখালেখি, সভা-সমিতি করেও পরিবেশ সুস্থ রাখা যাচ্ছে না। তাই আমাদের মতো শিক্ষিত মানুষকেই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে। স্যার, সেদিন আপনাকে আমরা কথা দিয়েছিলাম যে আমরা দূষণ প্রতিকারের কাজে উদ্যোগী হব। তাই আমরা কেউ এবার গরমের ছুটিতে বিদেশ-ভ্রমণে যাইনি।

তাই না কি অপূর্ব? তোমাদের কর্তব্যবোধ দেখে আজ আমি আনন্দিত–গর্বিতও বৈকি! তা তোমরা তোমাদের এলাকায় কি কি কাজ করলে?

স্যার, আমাদের পাড়ার দীঘিটিতে প্রায় লক্ষ্য করতাম বস্তির মানুষেরা বাসন মাজছেন, জামাকাপড় পরিষ্কার করছেন। কিন্তু এখন আমাদের সকলের মিলিত অনুরোধে সে সব কাজ বন্ধ হয়েছে। বেশ কিছু ফল-ফুলের গাছও লাগান হয়েছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এখন মনের আনন্দে ওখানে খেলাধূলা করতে পারে। সবুজ ঘাসের ওপর বসে থাকতে আমাদেরও খুব ভাল লাগে।

স্যার, নান্টুরাও এবার গরমের ছুটিতে ওদের পাড়ায় পরিবেশের ওপর একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। পরিবেশ দূষণের কারণ, তার প্রতিকার বিষয়ে ছবি, চার্ট, মডেল আরো কত সুন্দর সুন্দর লেখা সেখানে স্থান পেয়েছিল। অনেকে এসেছিলেন ঐ প্রদর্শনী দেখতে।

তাই না কি?, কৈ নান্টু, তুমি চুপচাপ বসে আছ। তুমি কিছু বলনি তো। তা বেশ বেশ। গরমের ছুটিতে তোমরা যে ভাবে সমাজকল্যাণের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলে সেটা যেন সমস্ত ছাত্র-যুবসমাজের আদর্শ হয়। যুববর্ষে তোমাদের এই অর্থবহ প্রচেষ্টা 'যুববর্ষ' পালনকে সার্থক করবে বৈকি! আজ ভাই আর সময় নেই। ছুটির ঘন্টা পড়ল বলে–পড়াশুনার কাজ কিছুই হলো না। তোমাদেরও ছুটি, আমারও আর ক্লাস নেই–চল অপূর্ব, তোমাদের পার্কে একটু বেড়িয়ে আসি।

হাঁদা-ভোঁদার

কমিকস ছিনতাই

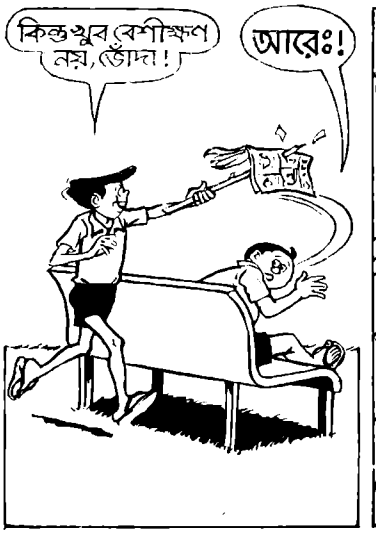

হিঃহিঃ! এবার গর্তে নেমে তোকে ওটা আনতে হবে, ভোঁদা!
পাজিটা নাগালের বাইরে পালিয়েছে!
ভোঁদাটার এখনো শিক্ষা হয়নি দেখছি। এবার নিয়ে তিনবার ওর কমিকস ছিনতাই হবে!
আবার তোর কমিকস হাতিয়েছি, ভোঁদা!
বেশ করেছিস, হাঁদা!
এটা আর যাতে ফিরে না পাস এবার সে ব্যবস্থা করছি!
ঠিক আছে, ওটা আমার বইই নয়!
ওটা কেঁদোদার বই!
গররর! আমার সেটটা নষ্ট করে দিলো, হতচ্ছাড়া পাজি—
ইরক!
হিঃহিঃ! বই পড়ে মজা পাওয়ার চেয়ে দেখে মজা পাওয়া অনেক বেশী মজার, হাঁদা!
গেছি রে!

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

কেমন আছো সকলে ? শুকতারার পুজো সংখ্যা কেমন লাগলো ? তোমরা যা যা চেয়েছিলে সবই তো প্রায় পেয়েছো। নিশ্চয়ই তোমরা খুব খুশি। কার লেখা কেমন লাগলো জানিও, কেমন !

দুর্গাপুজোর পর এখন তো কালীপুজোর তোড়জোড় চলছে। বাজির শব্দে চারদিক গমগম করছে। কালীপুজোর পরই ভাইফোঁটা। দিনটা ভারী মজার। সকাল থেকে ফোঁটা নেওয়া আর খাওয়া-দাওয়া। কী মজা! এর পরই জগদ্ধাত্রী পুজো। তারপর কার্তিক পুজো আর রাস। এবার দুর্গাপুজো কার্তিক মাসে পড়ায় সারা মাসটা পুজোয় পুজোয় কাটছে।

শরৎকাল এলেই প্রকৃতি সাজে নতুন সাজে। আসলে পুজোর জন্যে তৈরি হয়। শিউলি ফুলের গন্ধ মাতিয়ে রাখে চারদিক। স্থলপদ্ম গাছগুলো আলো করে ফুল ফুটে আছে। জবা ফুটছে দেদার। পুকুরে, ঝিলে কোথাও ফুটেছে পদ্ম কোথাও নাল ফুল। এখন তো হেমন্ত। তবু যেন শরতের জের চলছে।

ওদিকে ভোরের দিকে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। মাঠে ঘাটে হাল্কা কুয়াশার আস্তরণ। যে রোদ কদিন আগেও গায়ে জ্বালা ধরাতো তাকে এখন মিষ্টি মিষ্টি লাগে। বাতাসও দিক পরিবর্তন করছে। দক্ষিণ থেকে মুখ ফিরিয়ে আর কিছুদিনের মধ্যেই উত্তর দিক থেকে বইতে শুরু করবে। সেই বাতাসে ভেসে আসবে হিম। শীতের পরশ বুলিয়ে দেবে আমলকি গাছের ডালে ডালে। শুরু হবে পাতা ঝরার মরশুম।

রাত্তিরও বড় হচ্ছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে না হতেই সন্ধ্যের ছায়া নেমে আসে। রাত্তিরের আকাশ ঝলমলে। এই সময় চাঁদের আলো যেন তরল সোনার মতো গলে গলে পড়ে। আকাশের দিকে তাকালেই দেখতে পাবে ছায়াপথ চলে গেছে উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে। বৃশ্চিক রাশি হারিয়ে যাচ্ছে। তার বদলে পুব আকাশে বৃষ রাশি। বৃষ রাশির কৃত্তিকা নক্ষত্রের নাম থেকেই এই মাসের নাম কার্তিক।

তোমরা কত রকম প্রশ্ন করে চিঠি দাও। সব চিঠির তো আর উত্তর দেওয়া যায় না। তোমাদের কয়েকজন জানতে চেয়েছো 'বিশ্বাস' জিনিসটা কি। এ সব তো অনেক বড় ব্যাপার। বড় হয়ে জানতে পারবে। এখন শুধু এইটুকু জেনে রাখো–বিশ্বাস হচ্ছে শক্তি। বিশ্বাস থাকলে আর ভয় থাকে না। সব দুর্বলতা দূর হয়ে যায়। কিছু বুঝলে না তো ? আচ্ছা একটা গল্প শোন।

বিভীষণ ছিলেন রামচন্দ্রের পরম ভক্ত। তাঁর বিশ্বাস রাম নামই সব। রাম নামে অসাধ্য সাধন করে। একদিন একজন লোক এসে বিভীষণের কাছে হাজির। বললো, আমি সমুদ্রের ওপারে যাবো, আপনি ব্যবস্থা করে দিন।

বিভীষণ বললেন, এক্ষুণি করে দিচ্ছি। তারপর একটা পাতায় রাম নাম লিখে দিয়ে তার কাপড়ের সঙ্গে বেঁধে দিলেন পাতাটা। বললেন, তুমি নির্ভয়ে সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাও। কোনো ভয় নেই। বিশ্বাস রেখো। বিশ্বাস রাখলেই তুমি সমুদ্র পার হয়ে যাবে। অবিশ্বাস করলেই কিন্তু ডুবে যাবে।

লোকটা চলে গেলো। ধার্মিক বিভীষণের ওপর তার ভারী বিশ্বাস। বিভীষণ যখন বলেছেন তখন সে সমুদ্র পার হয়ে যাবে। তার মোটেই ভয় করলো না। দিব্যি সমুদ্রের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে লাগলো। দেখতে দেখতে মাঝ-সমুদ্র পার। এমন সময় তার মনে হলো, বিভীষণ তার কাপড়ে কি বেঁধে দিয়েছেন যার জোরে সে হেঁটে সমুদ্র পার হয়ে যাচ্ছে ? ডুবে যাচ্ছে না ! সে কাপড়ের খুঁট খুলে দেখলো একটা পাতায় শুধু রাম নাম লেখা।

লোকটার মনে অবিশ্বাস দেখা দিলো–শুধু রাম নাম লেখা–তাতেই সে হেঁটে সমুদ্র পার হচ্ছে ?

এ কথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে ডুবে গেলো।

বিশ্বাসের কত জোর দেখলে তো! মনে রেখো বিশ্বাস মনের জোর বাড়ায়। শক্তি আনে। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে এগিয়ে চললে তোমরা বড় হবেই। এই কথাটা ভুলো না, কেমন ?

আজ তাহ'লে এই পর্যন্তই।

আদর আর ভালোবাসা নাও।

দাদুমণি

তিন বন্ধু। শান্তু, পল্টু আর বাবাই।

তিনজনের ভারী ভাব। একে অন্যকে একদিনের বেশি না দেখতে পেলে ঠিক থাকতে পারে না। যেমন করেই হোক প্রত্যেক দিন অন্ততঃ একবার করে তিনজনের দেখা হওয়া চাই-ই চাই।

পরীক্ষা শেষ। শান্তু বলল, চল না রে কোথাও বেড়াতে যাই। বাবাই বলে, কিন্তু বাড়ি থেকে তো কোথাও যেতে দেবে না। শান্তু রেগে বলে, কেন দেবে না আমরা তো এখন বেশ বড়, ক্লাশ নাইন-এ পড়ছি।

পল্টু বলল, দূর, কোথায় যাওয়া হবে তাই ঠিক হলো না, শুধু ঝগড়া।

শান্তু বলল, চল না আমার মামার বাড়ি বালুরঘাটে।

বাবাই বলল, তা ঠিক, ওর মামা অনেকদিন থেকেই যেতে বলছিল, এই তো এবারও বলে গেছে।

সবাই এই প্রস্তাবের পক্ষে মত দিল। বাড়ি থেকে পারমিশনটাও পেয়ে গেল ওরা।

ভোর পাঁচটায় গাড়ি বালুরঘাট স্ট্যান্ডে এসে পৌছল। স্ট্যান্ড থেকে কিছুটা দূরেই শান্তুর মামার বাড়ি। ওরা হেঁটেই রওনা দিল। বাড়ির সবাই তখনও ঘুমিয়ে ছিল। ওদের ডাকাডাকিতে মামা মামিমা দুজনেই উঠে এলেন।

এ পাড়ায় বেশ কিছুদিন হলো মাঝে মধ্যেই চুরি হচ্ছে। পাড়ার 'নেতাজী সংঘের' ছেলেরা চেষ্টা চালিয়েও সক্ষম হয়নি কিছু করতে। সব শুনে বাবাই বলল, মামা, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।

মামা বললেন, কি?

–পাড়ার লোকজন নিশ্চয়ই রাত্রে পাহারা দিচ্ছে?

–হ্যাঁ, প্রত্যেক রাত্রেই।

–তবু চুরি হচ্ছে। এভাবে পাহারা দিলে চলবে না। হৈ, হৈ করে পাহারা দেওয়া চলবে না, নিঃশব্দে দিতে হবে।

কথাটা 'নেতাজী সংঘের' ছেলেদের বলতেই ক্লাবের সভাপতি ভোম্বলদা বলল, খারাপ বলেনি বাবাই।

পরের রাত্রে বাবাইয়ের কথা মতো এক গেরিলা আক্রমণের ব্যবস্থা করা হলো। কেউ রইল গাছের মাথায়, কেউ রইল ঝোপের আড়ালে, আবার কেউ ছাদে। ক্রমে রাত বাড়তে লাগল।

রাত তখন তিনটা কি সাড়ে তিনটা।

পাহারাদার সবাই ভাবছে আর বোধহয় এল না চোর বাবাজী। এমন সময় পাড়ার সদর রাস্তায় একটা ছায়ামূর্তিকে আসতে দেখা গেল। সবাই প্রস্তুত হয়ে নিল। ছায়ামূর্তিটা ভোম্বলদার বাড়ির আমগাছটার কাছে আসতেই আমগাছের ওপর বসে থাকা ভোম্বলদা ছায়ামূর্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সংগে সংগে দুজনেই অজ্ঞান।

চারদিক থেকে সবাই ছুটে এল। পাড়ার লোকজন সবাই জেগে উঠেছে। হৈ, হৈ রব। ভোম্বলদাকে ধরা-ধরি করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। সবাই ভোম্বলদাকে শাবাশ জানাচ্ছে।

এদিকে চোরের চোখে মুখে জল ছেটানোর সময় চোরের মুখে একজন টর্চ ফোকাস করতেই সবাই আঁতকে উঠল। এ যে ভোম্বলদার মামা। সংগে সংগে তাকেও বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করা হলো।

পরদিন সবাই মামার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইল।

মামা হেসে বললেন, দূর বোকা, দোষ তো তোদের নয়, তোরা তোদের কাজ করেছিস। ব্যাপারটা কি জানিস, কোলকাতা থেকে আসছিলাম, বাসটা আসার কথা পাঁচটায়, এলো তিনটায়। যা হবার হয়ে গেছে, আর শোন যার জন্য আমাকে এই দুর্ভোগ সহ্য করতে হলো তাকেও আমি ছাড়ব না। আমিও তোদের সংগে পাহারা দেব।

সবার চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল।

হৈ হৈ করে উঠল সবাই, থ্রি চিয়ার্স ফর মামাবাবু, হিপ্, হিপ্, হুররে।

সুজিতকুমার বসাক
গংগারামপুর উচ্চবিদ্যালয়
একাদশ শ্রেণী বয়স–ষোল

★ ছবিটিও সুজিতের আঁকা

দেবারতি দাস বয়স চোদ্দ, অষ্টম শ্রেণী বিহার

কান টানলে

কান কটকট, প্রাণ ছটফট
বিদঘুটে এক রোগ,
হাসপাতালে ছুটল হারু
সারাতে দুর্ভোগ।
কান দুটি তো কাটতে হবে
বলল দেখে ই. এন. টি,
সঙ্গে সঙ্গে ও.টি-র ঘরে
বসল যেন ভিয়েনটি।
বলল হারু, কান হারালে
দেখব কেমন চক্ষে,
কোনটা ভেড়া, কোনটা গরু
চিনব কি আর লোককে?
বদ্যি ভাবেন, কী যোগাযোগ
চক্ষু এবং কর্ণে,
অ্যানাটমি হাতড়ে শেষে
হলেন তিনি হন্যে।
খোলসা করে বললে হারু,
কানটি যদি কাটি,
কেমন করে আটকাব এই
চশমা দুটোর ডাঁটি?

শিবনারায়ণ রক্ষিত বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী
কামাখ্যা বিদ্যালয়, মালিগাঁও, আসাম

প্রবীরকুমার চক্রবর্তী বয়স এগারো, অষ্টম শ্রেণী
সেন্ট জেভিয়ার্স হাইস্কুল, চাঁইবাসা-বিহার

দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বয়স চোদ্দ, অষ্টম শ্রেণী
পুরুলিয়া জিলা স্কুল, পুরুলিয়া

ঘুরে এলাম মানস-কৈলাস

শুভাশীষ বিশ্বাস

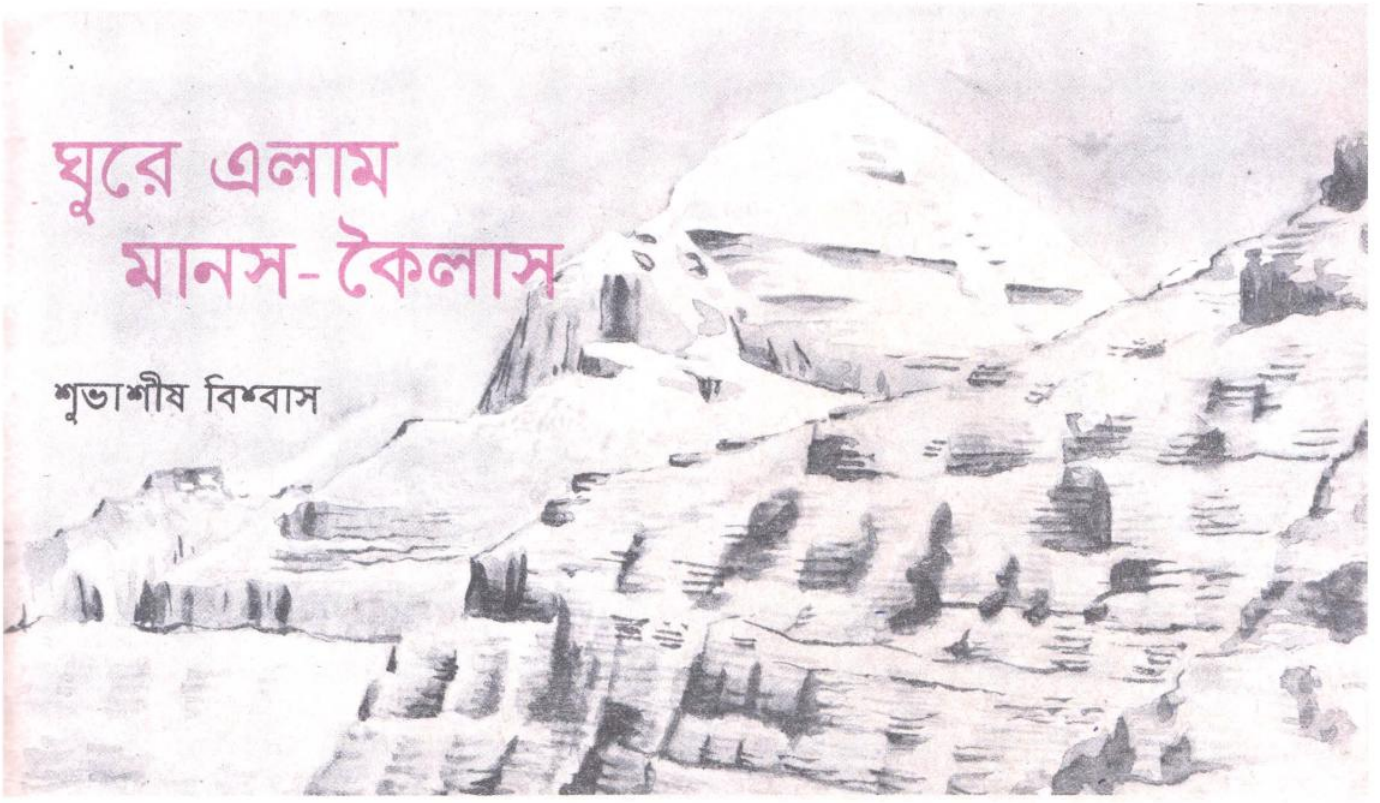

১

চার দেওয়ালের মধ্যে দিনের পর দিন একঘেয়ে ছন্দে কলমের আঁচড় দিতে দিতে মনটা আমার হাঁপিয়ে উঠেছিল। কাজকর্ম, চলাফেরা সবকিছুই যেন করতাম আহত সৈনিকের মতো একান্ত বাধ্য হয়ে। তাই ভেবেছিলাম, দিনকতক বাইরে থেকে ঘুরে আসব। কিন্তু যাব কোথায়? –ঠিক করতে পারছিলাম না। এমন সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল, ঘটনা না বলে যোগাযোগ বলাই ভালো। ব্যাপারটা খুলেই বলি। গত এপ্রিল মাসের শেষের দিকে একদিন খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনের ওপর নজর পড়ল। বিজ্ঞাপনের সারমর্ম হলো, ভারত সরকারের তরফ থেকে মানস-কৈলাসে তীর্থযাত্রী পাঠানো হবে, আগ্রহী ভারতীয়দের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনটা দেখার পর থেকেই আনন্দে মনটা ভরে উঠল, চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল হিমালয় তিব্বতের সেই ভুবন ভোলানো, দুচোখ জুড়ানো প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, আর মানস-কৈলাস, সে তো স্বর্গরাজ্য–স্বর্গের অংশমাত্র! এবার আমিও হয়তো সেই স্বর্গরাজ্যে যেতে পারব। লিখে ফেলি একটা পত্র ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরে, নতুন দিল্লীর ঠিকানায়। কিছুদিন পরে পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করে বলা হলো, 'নির্বাচিত হলে যথাসময়ে জানানো হবে।'

দিন গড়িয়ে যায়। কোনো চিঠিপত্র পাই না। আমিও কোনো খোঁজখবর করি না। কাজের ভিড়ে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম দরখাস্তের কথা। তারপর হঠাৎ আর এক চমক। আমার নামে একটা টেলিগ্রাম, তাতে লেখা ছিল আগামী ১৮ই জুলাই বেলা ৯-৩০ মিনিটের মধ্যে নতুন দিল্লীর বৈদেশিক দপ্তরে উপস্থিত হতে হবে। সাক্ষাৎকারীকে অবশ্যই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে ব্লাড-প্রেসার বা হার্টের রোগী হলে চলবে না। যথেষ্টসংখ্যক গরম জামাকাপড় ও টাকা সঙ্গে থাকা চাই, ইত্যাদি।

নিজেকে যথার্থই ভাগ্যবান মনে হলো। মনে মনে বললাম, যেমন করেই হোক–যেতে আমাকে হবেই। অথচ হাতে সময় বেশি নেই। তাই আমিও একটা টেলিগ্রাম করে, আমি যাচ্ছি জানিয়ে দিলাম। তারপর আত্মীয় বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাদের শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদকে পাথেয় করে, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে যথাসময়ে যথাস্থানে হাজির হলাম। দেখলাম আমার মতো আরো অনেকে উপস্থিত হয়েছেন।

কাগজপত্র পরীক্ষা করে একটা বিরাট হলঘরে বসতে বলা হলো। সর্বসাকুল্যে ২৫ জনের দল। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সকলে এসেছেন। এর মধ্যে দুজন প্রবাসী

তাকলাকোটে , মানস সরোবর যাত্রীরা।

ভারতীয় ও চারজন মহিলা ছিলেন। মহিলাদের মধ্যে একজন এসেছেন সুদূর আমেরিকা থেকে। যাত্রীদের মধ্যে ৬ জন বাঙালী। সর্বজ্যেষ্ঠ একজন স্বামীজী, বয়স ৬৭বৎসর। ইনিও বাঙালী। সবচেয়ে কম ? যিনি আমাদের সংগী হয়েছেন তিনি এক ২৬।২৭ বছরের যুবক, নাম মিঃ পাল।

এরপর বিদেশ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানালেন, মানস-কৈলাস হিন্দুদের এক পবিত্র তীর্থ, প্রাচীন ঋষিদের সাধনাক্ষেত্র। আগে তুষারাবৃত বন্ধুর পর্বতের ওপর দিয়ে দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে যেতে হতো, পথে ছিল বন্য জন্তু আর ডাকাতের উৎপাত। দুর্যোগ পূর্ণ আবহাওয়া, পাহাড়ী ধস, খাদ্যাভাব ইত্যাদি ছিল তীর্থযাত্রী দের নিত্যসংগী। এত বিপদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ধর্মভীরু প্রকৃতিপ্রেমিক মানুষ এসেছেন এই তীর্থভূমিতে। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ জৈন গ্রন্থ সর্বত্রই এর নিখুঁত বর্ণনা আছে। তিনি আরো জানালেন, এখনও এই পথে যে কোনো সময়েই বিপদ আসতে পারে, তবে বন্য জন্তু বা চোর ডাকাতের ভয় নেই। রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে, ফলে পায়ে হাঁটার পথ অনেক কমেছে। তবু আজও ইচ্ছামত এই তীর্থে যাওয়া যায় না। কারণ তিব্বত এখন প্রজাতন্ত্রী চীনের অধীন। ১৯৬২ সালের পর থেকে এই অঞ্চল ভারতীয়দের কাছে নিষিদ্ধ রাজ্য ছিল। সম্প্রতি চীন-ভারত সম্পর্কের উন্নতি হওয়ায় প্রতি বছর মুষ্টিমেয় কিছু ভাগ্যবান এই মহাতীর্থ ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে থাকেন। বিদেশ দপ্তরই প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে যাত্রী সংগ্রহ করে থাকে এবং নির্বাচন পর্যন্ত যাবতীয় দায়িত্ব তারাই পালন করে থাকে। এরপর এক অভিজ্ঞ পর্বতারোহী এই পথের সম্বন্ধে আমাদের আরও কিছু বললেন। তিনি বললেন, পার্বত্য পথের দুধারে নয়নাভিরাম দৃশ্য আপনাদের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করবে। সেই মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অবশ্যই উপভোগ করবেন, কিন্তু চলতে চলতে নয়–নিরাপদ জায়গায় দাঁড়িয়ে। চলার সময় সবসময়ই পথের দিকে খেয়াল রাখবেন। লাঠির সাহায্যে কিভাবে চলার কষ্ট

বাস ছেড়ে এবার হাঁটা পথে। তাওয়াঘাটে যাত্রার প্রস্তুতি চলছে।

কমানো যায় তাও বুঝিয়ে বললেন। পাহাড়ের নিচু জায়গার দিকে তাকিয়ে অহেতুক ভয় পেতে নিষেধ করলেন। ঝর্ণা বা নদীর ধার দিয়ে চলার সময় বা বৃষ্টিতে ভেজা পথ দিয়ে চলার সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের উপদেশ দিলেন।

এইসব হতে হতেই বেলা গড়িয়ে গেল। আমরা দুপুরের খাওয়া সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। বিকালে আমাদের রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ওখানে যাত্রীদের X-Ray ও ECG করা হয়। পরের দিন সকালে রক্তচাপ পরীক্ষা করে দুজনকে unfit ঘোষণা করা হলো। বাতিল যাত্রীদের একজন তো হাউমাউ করে কান্না শুরু করে দিলেন। তাঁর কান্না দেখে একজন ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন, এই অবস্থায় আপনাকে পাঠালে আপনার বদলে কাঁদতে হবে আপনার পরিবারের লোকজনকে। দুজন বাতিল হওয়ায় আমাদের যাত্রীসংখ্যা কমে দাঁড়াল ২৩।

২০ তারিখে উত্তর প্রদেশ সরকারের পর্যটন সংস্থা 'কুমায়ুন মন্ডল বিকাশ নিগমে' আমরা প্রত্যেকে ২৭৫০ টাকা জমা দিলাম, দিল্লী থেকে লিপুলেক পাস পর্যন্ত যাওয়া এবং লিপুলেক পাস থেকে দিল্লী পর্যন্ত ফেরার যাবতীয় খরচের জন্য। আমরা সকলেই এ-পথের নূতন যাত্রী। কারোরই ঠিকমত জানা নেই এই দুর্গম পথে কি কি

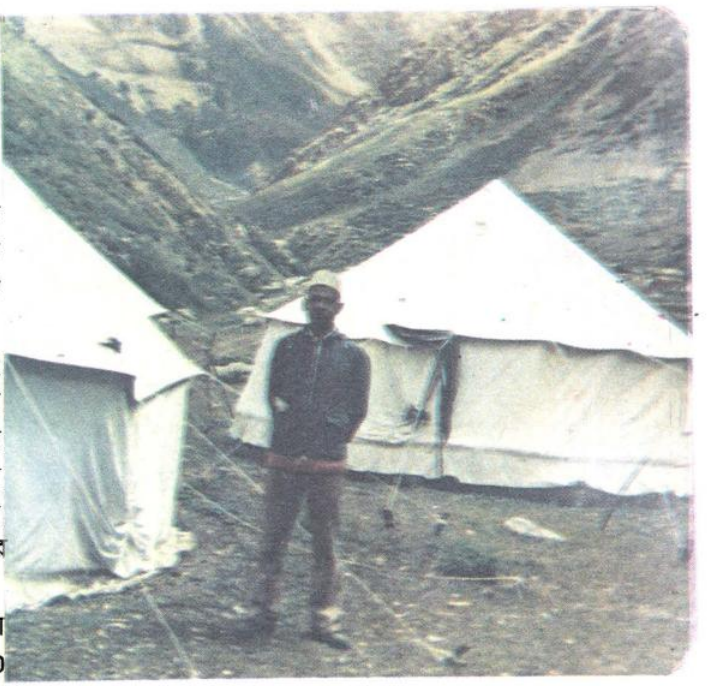

কৈলাসের পথে কালাপানি ক্যাম্পে।

জিনিসের প্রয়োজন হয়। আমাদের একটা তালিকা দেওয়া হলো। পরের দিনটি তালিকা মতো গরম পোশাক, ঔষধ, বেডিং ইত্যাদি, শুকনো খাবারও অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস কেনাকাটা করতেই কেটে গেল।

২৩শে জুলাই আমরা রিজার্ভ ব্যাংকের পারমিট ও চীনা সরকারের ভিসা পেলাম। ঐদিনই আমাদের সকলের কাছ থেকে 'গ্যারান্টি বন্ড' জমা নেওয়া হলো। এই বন্ডে লেখা থাকে ভ্রমণের পথে ভ্রমণ কারীর অংগহানি বা মৃত্যু হলে ভারত সরকার দায়ী থাকবেন না। তারপর মুদ্রা বিনিময়। ৫২০০ ভারতীয় মুদ্রার বদলে ৪৫০ আমেরিকান ডলার। এইসব পর্ব চুকে যাওয়ার পর আমাদের জানিয়ে দেওয়া হলো, আগামীকালই যাত্রা শুরু।

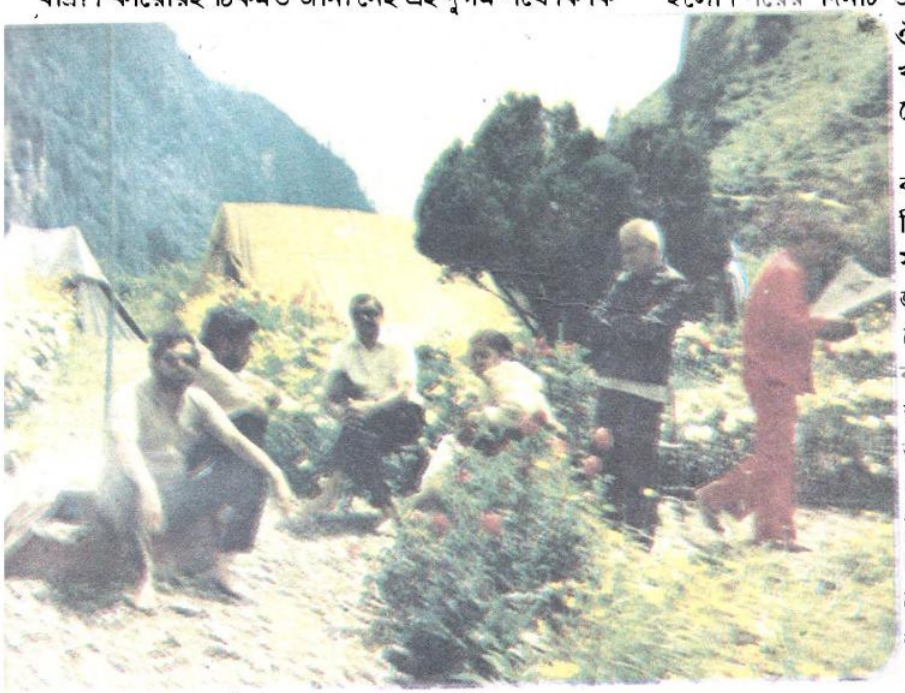

হাঁটাপথে বুদ্ধিতে বিশ্রাম।

[চলবে]

সাহেব বাংলোর ভূত

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ও কে?

প্রসেনজিৎবাবু সব কিছু শুনে গম্ভীর হয়ে বলেছেন, আমার তো মনে হচ্ছে বাংলোর বারান্দায় ওই পাহাড়ী বিচ্ছুর আবির্ভাবের পেছনে কোনো অদৃশ্য হাত থাকা বিচিত্র নয়।

আমি বললাম না, তবে দেড়শো বছর আগে মৃত ডেনিস সাহেবের দ্বারা যে একাজ হয় নি তা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

প্রসেনজিৎবাবু বললেন, সে তো বটেই। সাহেব বাংলোর ভূত যে আসলে রক্তমাংসের সে প্রমাণ তো ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে–বলতে বলতে একটা লোডেড রিভলবার আমার হাতে দিয়ে বললেন, এটা রাখুন, মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে কাজে লাগতে পারে।

প্রসেনজিৎবাবু ভুল কিছু বলেন নি। মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই সে কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল।

কিন্তু পরের কথা পরে। তার আগের কথায় আসা যাক।

গত দিনের মতো আজও দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে বাংলোর বারান্দায় একটা গল্পের বই নিয়ে বসেছিলাম। পাশেই সেই লোডেড রিভলবারটা।

একটু আগে দিবাকরের বউ তুলসী রান্নার কাজ চুকিয়ে ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে বাংলো ছেড়ে চলে গেছে। প্রসেনজিৎবাবুও রোজকার মতো বেরিয়েছেন ইনসপেকশানের কাজে।

বাংলোয় আমি একা।

বাবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম। বারবার মনে পড়ছিল মেঘনাদের কথা। মেঘনাদের গতকালই ফেরবার কথা ছিল। এখনও ফেরে নি। কে জানে কোথায় গেছে, কী করছে। সময় না হলে তো মনের কথা কখনও খুলে বলে না।

গতকালের মতোই নিথর দুপুর অলস হয়ে পড়ে রয়েছে। কোথায় কোন গাছে বসে এক ঘুঘু ডাকছে–কুব-কুব-কুব...!

ক্যাঁ....চ্...।

বাংলোর মরচে ধরা লোহার গেটটা খোলার শব্দে চোখ তুলে তাকালাম।

একজন লোক গেট পেরিয়ে ভেতরে আসছে।

লোকটার চেহারা স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের

মতোই। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। খালি গা, পরনে শুধু খাটো ধুতি, হাতে একটা টিনের স্যুটকেশ।

লোকটা গেট পেরিয়ে একবার থমকে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালো, তারপর সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। কে লোকটা? এই ভরদুপুরে বাংলোয় এসে ঢুকছে কোন প্রয়োজনে?

লোকটা বাংলোর বারান্দার সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর স্থানীয় উচ্চারণের টানে বললো, সাহেব আছে নাকি গ?

সাহেব অর্থে ও নিশ্চয়ই প্রসেনজিৎবাবুকে বোঝাতে চাইছে।

আমি বললাম, না, সাহেব বেরিয়েছে, কী দরকার?

এট্টা জরুরী চিঠি আছে। সাহেব এলে দিয়া দিবে বাবু। আর এই বাক্সটা।

বলতে বলতে কোমরের কাপড়ের ঘুনসি থেকে বার করে একটা মুখবন্ধ খাম আর একটি টিনের স্যুটকেশ এগিয়ে দিল।

খামটা হাতে নিয়ে দেখলাম খামের ওপর প্রসেনজিৎবাবুর নাম লেখা রয়েছে, কিন্তু পত্রদাতার নাম কোথাও নেই। স্যুটকেশটাও বেশ ভারি মনে হলো।

কে পাঠিয়েছে এই চিঠি আর স্যুটকেশ?

মুখ তুলে দেখি সেই অচেনা আগন্তুক দ্রুত পদে বেরিয়ে যাচ্ছে গেটের বাইরে।

চিৎকার করে ডাকলাম, এই যে, শোন, শুনে যাও।

লোকটা শুনতে পেল কিনা জানি না। কিন্তু একবারও ফিরে তাকালো না। চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে।

আমি সেই নির্জন দুপুরে বাংলোর বারান্দায় অজানা পত্রবাহকের চিঠি আর স্যুটকেশটা নিয়ে কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

চিঠির রহস্যভেদ

সন্ধ্যেবেলা বাংলোয় ফিরে প্রসেনজিৎবাবু আমার মুখে তাঁর চিঠি আর স্যুটকেশের ইতিবৃত্ত শুনতে শুনতে বেশ অবাক হয়েছেন বোঝা গেল।

ও দুটো হাতের কাছে টেনে নিতে নিতে বললেন, এভাবে আমায় এসব কে পাঠাতে পারে তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

বললাম, দুটোই খুব সাবধানে খুলবেন। এর পেছনে কার কী বদ মতলব আছে কে জানে!

প্রসেনজিৎবাবু বললেন, হুঁ, ডিটেকটিভ বইগুলিতে তো হামেশাই এমন কাহিনী পাওয়া যায় যেখানে অপরাধী গোয়েন্দাকে খতম করার জন্য নানা অছিলায় মৃত্যুদূত পাঠায়—কখনও উপহার হিসাবে ফুলের তোড়া, বই বা স্যুটকেশের মধ্যে কখনও বা অন্য কোনো জিনিসের সাহায্যে। গোয়েন্দামশাই ভুল করেও যদি কখনও সেই মরণফাঁদে পা দিয়ে বসেন তবে তো বাঁচবার আর আশাই থাকে না।

আমি বললাম,—অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গোয়েন্দা ভুলের ফাঁদে পা দেন না। বেচারী ক্রিমিনালের কষ্টটাই সার হয়। পাঠক অবশ্য সে রুদ্ধশ্বাস বিবরণ পড়ে আনন্দ পায়।

প্রসেনজিৎবাবু বললেন, কিন্তু আমি তো গোয়েন্দা নই, সুতরাং নিয়মটা আমার ক্ষেত্রে নাও খাটতে পারে।

তা বটে, আমি ঘাড় নাড়ি। বলি, আপনি বরং চিঠিটাই খুব সাবধানে খাম খুলে বার করে পড়ে নিন। কোনো সূত্র ওর মধ্যেও পেয়ে যেতে পারেন।

প্রসেনজিৎবাবু বললেন, ঠিক বলেছেন। বলতে বলতেই সাবধানে খামের মুখটা ছিঁড়তে শুরু করলেন উনি।

খামের মুখ ছিঁড়তে ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক নাতিদীর্ঘ চিঠি।

চিঠির হস্তাক্ষর খুবই পরিচিত। প্রসেনজিৎবাবু চিঠির শেষে প্রেরকের নামটা চোখ বুলিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন, যাঃ বাব্বা!

চিঠির প্রেরক মেঘনাদ ভরদ্বাজ ছাড়া আর কে!

আর চিঠিটা আমাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা।

মেঘনাদের চিঠি

"প্রিয় অর্ণব,

তুই যে আমার জন্যে ঘোরতর চিন্তা শুরু করেছিস তা তোকে না দেখেও এই মুহূর্তে অনুমান করতে পারি। তবে এটুকু জানবি, একদিন বলে দুদিন ডুব দিয়ে আশার অতিরিক্ত কিছু লাভ করেছি। সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য, তবে সাহেব বাংলোর ভূত রহস্যের পঞ্চম অঙ্কে ঢুকে পড়েছি আমরা। সম্ভবত শেষ দৃশ্য অভিনীত হবে আজই রাত্রে।

হ্যাঁ, আজই রাত্রে।

আমি যে খবর যোগাড় করেছি তাতে বলতে পারি আজ রাত ঠিক তিনটে নাগাদ চন্দ্রানী শ্বশুর বাড়ি যাত্রা করবে।

চন্দ্রানীর শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার সংকেতটা ভেদ করতে

_কে লোকটা ? এই ভরদুপুরে বাংলোয় এসে ঢুকছে কোন প্রয়োজনে ?

পেরেছিস ? যদি না পারিস, অনুরোধ করবো অন্তত আজকের রাতটার জন্যে অপেক্ষা কর।

আজকের রাতে তোর এবং প্রসেনজিতের অনেক দায়িত্ব।

প্রসেনজিৎ নিজে এ্যাডভেঞ্চার ভালবাসে বলে জাহির করে, আমি এখন শুধু এটুকু বলতে পারি এমন সুযোগ ও হয়তো জীবনে আর কখনও পাবে না।

এখন তোদের যা যা করতে হবে বলি–

প্রথম কথা আজকের রাতে তোদের একসঙ্গে ঘুমলে চলবে না। দুজনেই সজাগ থাকবি, তবে ঘরের আলো নিভিয়ে রাখিস।

রাত ঠিক তিনটে নাগাদ বাংলোর জানলা থেকেই দেখতে পাবি জঙ্গলের মধ্যে একজায়গায় আলোর সংকেত দুলছে (যেমনটি আমরা আগেই দেখেছি)। যদি সংকেত কোনো কারণে দেখতে নাও পাস এটা দেখতে পাবি সাহেব বাংলোর কুয়োর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে ডেনিস সাহেবের ভূত। তার হুঙ্কার ইত্যাদি শুনে ভয় পাস নি যেন, কারণ ইতিমধ্যেই আমরা বুঝে নিয়েছি ওসব সাজানো। তোদের প্রধান দায়িত্ব ডেনিস সাহেবের ভূত ছদ্মবেশীকে অনুসরণ করে উপযুক্ত জায়গায় তাকে পাকড়াও করা। তবে বাংলো থেকে বেরুবার সময় উপযুক্ত পোশাক আর রিভলবার নিতে ভুলিস নি। সঙ্গে টর্চ তো অবশ্যই নিবি। আশা করি রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজের উপযুক্ত এ্যাসিসটেন্টই হতে পারবি। আর জানবি আমি কাছাকাছিই থাকবো।

ইনসপেক্টর তিনকড়ি পোদ্দারকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে এসেছি। সমস্ত অভিযানটাই খুব গোপনে হওয়া প্রয়োজন। এতে যদি আমরা সফল হই, জানবি এক মস্ত অপরাধী চক্রের দাঁত আমরা ভাঙতে পারবো।

আমার স্থানীয় আদিবাসী লোধার ছদ্মবেশটা নিখুঁতই হয়েছে বুঝতে পারছি। তুইও যখন আমার হাত থেকে চিঠি নেবার সময় আমায় চিনতে পারিস নি, তখন অপরের চোখকেও ফাঁকি দিতে পারবো ।

চিঠিটা তোর নামে না লিখে প্রসেনজিতের নামে লিখতে হয়েছে কারণ তা না হলে হয়তো আমার সামনেই ওটা খুলে পড়তে শুরু করতিস–যেটা আমার পক্ষে খুবই অসুবিধেজনক হতো।

টিনের স্যুটকেশ খুলে দেখে নিস। রাতের অভিযানের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আছে। চিঠিটা তুই আর প্রসেনজিৎ পড়ে ছিঁড়ে ফেলিস।

শুভেচ্ছাসহ–

মেঘনাদ ভরদ্বাজ"

ভূত শিকারে যাত্রা

প্রথম রাতটা আমরা ঘুমিয়ে নিলাম।

ঘড়িতে এ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম। রাত আড়াইটের সময় এ্যালার্মের শব্দে ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম।

অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে নিলাম। এরপর প্রতীক্ষার পালা।

আমাদের দুজনেরই পরনে সম্পূর্ণভাবে নিশাচরের পোশাক। দুজনেরই কোমরে ঝুলছে টর্চ, পকেটে রিভালবার ছাড়াও একটা ছুরি। এইসঙ্গে প্রসেনজিৎবাবু পিঠে ঝুলিয়েছেন একটা রাইফেল।

প্রসেনজিৎবাবু বললেন, বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করছি অর্ণববাবু। তবে ভূত শিকারে যাত্রার সময় এসব ছুরি-ছোরা না নিয়ে এক খাবলা করে সর্ষে পোড়া নিলেই বোধহয় ভাল হতো। বলতে বলতে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন।

আমি বললাম, ভূত-কিম্ভূতের কথা বাদ দিলেও জঙ্গলে বিষাক্ত সাপ বা হিংস্র জানোয়ার থাকা বিচিত্র নয়। প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে মোকাবিলাও করতে হতে পারে।

প্রসেনজিৎবাবু বললেন, সাপ-খোপ কিছু থাকলেও হিংস্র জানোয়ার বলতে মানুষ আর কিছু এ জঙ্গলে রাখে নি। থাকার মধ্যে আছে হরিণ, খরগোশ জাতীয় কিছু নিরীহ জন্তু কিংবা বুনো শুয়োরের দল। হাতির পায়ের ছাপ কখনও সখনও দেখা যায় বটে কিন্তু হাতি আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নি, অতএব.....

অতএব আপনি যত নিশ্চিন্তই হোন আমি হতে পারছি না।

হু-উ-উ-উ-ম্.....!

অকস্মাৎ আমরা চমকে উঠলাম। রাতের স্তব্ধতা খান খান করে ফেললো এক অমানুষিক রক্ত-জল-করা হুঙ্কার।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম বাংলোর জংলাবাগানের সেই পুরোনো প্রায় শুষ্ক কুয়োটা থেকে উঠে আসছে একটা মূর্তি।

ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো কুয়োর বাইরে।

কৃষ্ণপক্ষের মরা চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল সাত ফুট দৈর্ঘ্যের সেই সাদা মূর্তিটা। ওকে আর এক রাতেও আমি দেখেছি গভীর রাতে বাংলো থেকে বেরিয়ে যেতে। লোকে বলে ও একশো বছর পূর্বে মৃত নীল কর সাহেব ডেনিস সাহেবের অশরীরী দেহ।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? সে বোঝাপড়া হবে আজই রাতে। জানি না কী আছে কপালে।

ও ততক্ষণে বাংলোটাকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে সেই অমানুষিক হুঙ্কার। আমরা ঘরের আলো নিভিয়ে জানলার পাশে অন্ধকারে গা মিশিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। মাঝে মাঝে তাকাচ্ছি জঙ্গলের দিকে।

ঠিক যা আন্দাজ করা হয়েছে তাই ঘটলো। দূর জঙ্গলের মধ্যে একটা আলোর শিখা জ্বলে উঠলো। সেটা দুলতে লাগলো ডানদিক থেকে বাঁদিক আবার বাঁদিক থেকে ডানদিকে।

আমি এখন জেনে গেছি ওটা একটা সংকেত। যে রাতে পশুপতি ভট্চায জঙ্গলের মধ্যে প্রাণ দিয়েছিলেন সে রাতেও আমি আর মেঘনাদ ওই একই জায়গায় আলোর দুলুনি দেখেছিলাম।

আজও কি কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে? এবার কার পালা?

এক সময় আর একটা ভয়ঙ্কর গর্জন তুলে ও এগিয়ে গেল বাংলোর গেটের বাইরে।

খুব সন্তর্পণে বাংলোর দরজা খুলে বেরিয়ে এসে আমরাও অনুসরণ করলাম তাকে।

ভূতের জুতো

আমরা এগিয়ে চলেছি জঙ্গলের পথে। যেহেতু প্রসেনজিৎবাবু ফরেস্ট অফিসার হিসেবে এ পথের সঙ্গে বেশ ভালভাবেই পরিচিত তাই ওঁর সঙ্গে আশাতীত দ্রুত পদক্ষেপেই চলেছি।

প্রসেনজিৎবাবুর চাপা কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙলো, অর্ণববাবু, ওই দেখুন।

সামনে গাছপালার বাধা ভেদ করে মরা চাঁদের ফ্যাকাশে জ্যোৎস্না নেমে এসেছে মাটিতে। যেটুক ঠাওর হয় দেখলাম সেই অমানুষিক মূর্তিটা এগিয়ে চলেছে। মাঝে কিছুক্ষণের জন্য ওকে হারিয়ে ফেলেছিলাম জঙ্গলের গাছ-গাছালির আড়ালে।

কিন্তু কী অসম্ভব দ্রুত চলেছে ওই অমানুষিক অবয়ব যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছে। সত্যি কি এমন ভাবে হাঁটতে কোনো মানুষে পারে?

এই সেই জায়গা, যেখানে এর আগের বার এসে পশুপতি ভট্চাযের মৃতদেহটা পেয়েছিলাম।

দুলন্ত আলোর সংকেত এখন অনেকটা কাছাকাছি।

ছলাৎ ছলাৎ জলের শব্দ শুনছি। আমরা কি নদীর কাছাকাছি পৌঁছে গেছি?

গর্জে উঠলো প্রসেনজিৎ বাবুর রাইফেল।

মূর্তিটা এগিয়ে চলেছে আলোর সংকেতের কাছাকাছি। পেছনে আমাদের উপস্থিতি বোধহয় টের পায় নি।

হঠাৎ এক অঘটন।

কখন এক সময় পিঠ থেকে রাইফেলটা নামিয়ে এনে প্রসেনজিৎবাবু রাইফেলের 'সেফটি ক্যাচটা' নামিয়ে ফেলেছেন খেয়াল করি নি। খেয়াল যখন করলাম তখন দেরি হয়ে গেছে।

গুড়ুম!

রাতের স্তব্ধতাকে ছিন্ন করে গর্জে উঠেছে প্রসেনজিৎবাবুর রাইফেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সামনের মূর্তিটা একটা টাল খেয়ে উঠেই যেন উঠে গেল চোখের সামনে থেকে এবং কিছুদূরের আলোর সংকেতটাও নিভে গেল চকিতের মধ্যে।

এ কী করলেন প্রসেনজিৎবাবু! আমি প্রায় হাহাকার করে উঠে ওঁর দিকে তাকালাম।

মেঘনাদ চিঠিতে লিখেছে জ্যান্ত ভূতটিকে আজ রাতেই গ্রেফতার করে তার স্বরূপ জানতে হবে। কিন্তু ও যেভাবে লম্বা পা ফেলে ছুটে চলেছে তাতে ওর নাগাল পাওয়াই মুশকিল। তাই জ্যান্ত না পাই মৃতই ধরবো আমি ওকে।

বলতে বলতে প্রসেনজিৎবাবু নিজেই এগিয়ে গেলেন জায়গাটার দিকে।

কিন্তু কোথায় কী? মানুষ কিংবা ভূত কারুরই টিকিই দেখা গেল না সেখানে।

তবে ছোট্ট পেনসিল টর্চের আলো ঘুরিয়ে ফেলতে ফেলতে পাওয়া গেল অন্য একটা জিনিস—এক পাটি জুতো।

সে এক অদ্ভুত জুতো। জুতোর সোলটাই অন্ততঃ দু ফুট উঁচু।

সাত ফুট দৈর্ঘ্য ভূতের একটা সমস্যা অন্ততও সমাধান হলো। সাহেব বাংলোর সাহেব ভূত ওই বিশেষ 'রন্‌পা জুতো' পরে হাঁটতো বলেই তার উচ্চতা এবং গতি বেড়ে গিয়েছিল অস্বাভাবিক।

প্রসেনজিৎবাবু কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই পায়ের নিচে কি যেন একটা ঘটে গেল।

আমি আর প্রসেনজিৎবাবু হুড়মুড় করে তলিয়ে গেলাম পাতালের গর্তে।

[চলবে]

বিশ্ব-পরিচয়

মানেই

পৃথিবীর ইতিহাস

পৃথিবীর প্রতিটি দেশের বিবরণ

পাঁচশতাধিক একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্রে সমৃদ্ধ ৭০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। আধুনিক সেট আপ, সুদৃশ্য বাঁধাই। দাম ৪০ টাকা।

৪০ টাকা পাঠালে রেজেস্টারী করে পাঠান হয়।

দেব সাহিত্য কুটীর /২৯, শ্যামাপুকুর লেন/কলি-৯

Registration No. W.B./E.C.–60 October '85 "Suktara"

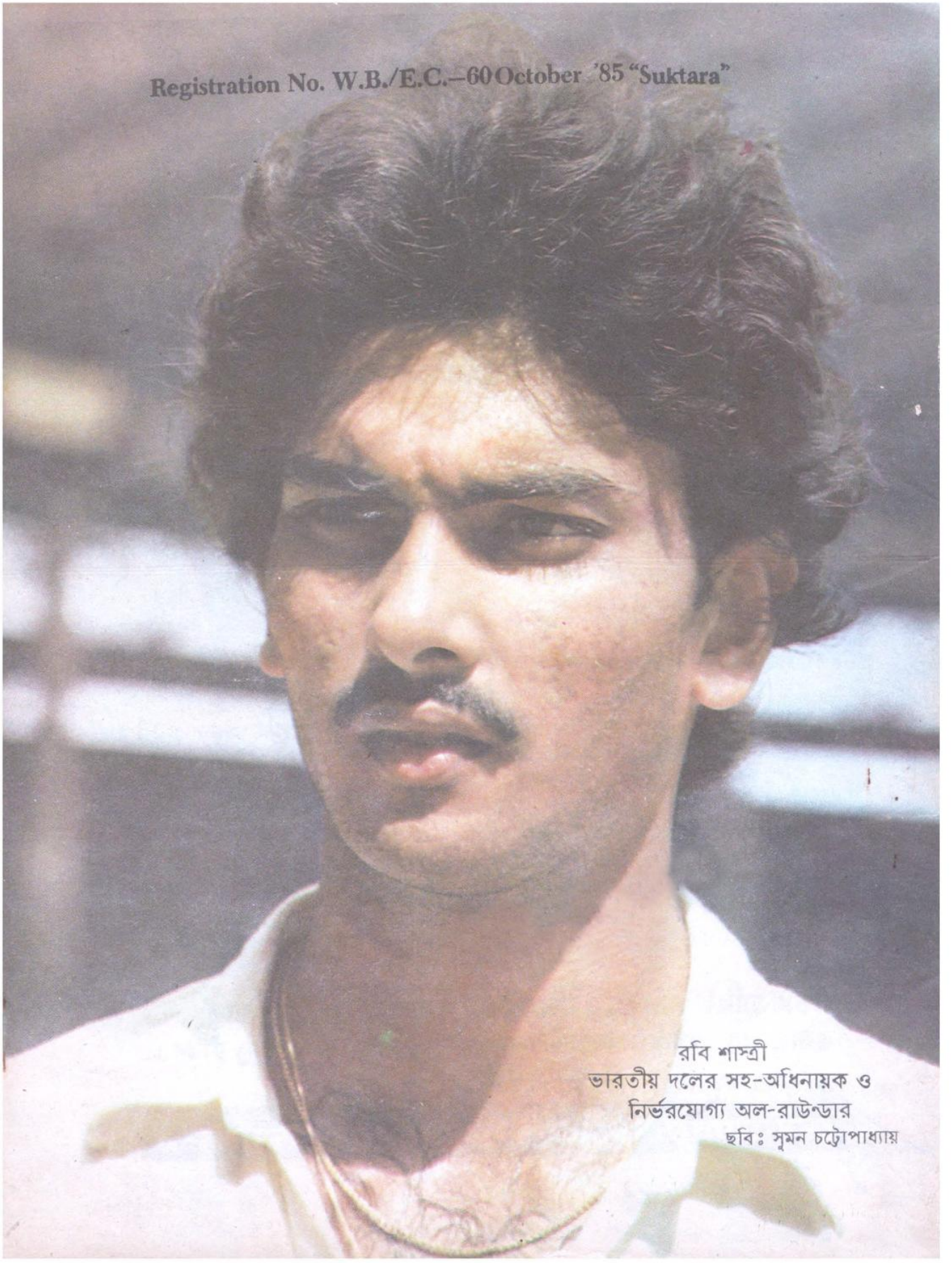

রবি শাস্ত্রী
ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক ও
নির্ভরযোগ্য অল-রাউন্ডার
ছবিঃ সুমন চট্টোপাধ্যায়